পঞ্চম অধ্যায়

নিম্নবর্গ ভাবনার নতুন সাহিত্যিক নির্মাণ জায়মান সমাজ-বীক্ষা : একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকের নির্বাচিত উপন্যাস

এই পর্যন্ত যে সব উপন্যাসের আলোচনা হয়েছে তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে গেল যে বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক কণ্ঠস্বর একটা বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বাংলা উপন্যাসে বিভিন্ন সময়েই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে এক একটা বাঁক বদল ঘটেছে। যেমন আমরা জানি বহুবিজ্ঞাপিত কল্লোলের লেখককুল কয়লাকুঠিতে, খোলারবস্তিতে, ফুটপাতে, প্রতারিত ও পরিত্যক্ত এলাকায় বাস্তবতার অনুসন্ধান করেছিলেন। তবে চল্লিশের দশক, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বিয়াল্লিশের আন্দোলন, তেতাল্লিশের মন্বন্তর, দাঙ্গা, দেশভাগ, সাতচল্লিশের স্বাধীনতা, কৃষক বিদ্রোহ, উদ্বাস্তুদের হাহাকার—এইসব ঘটনার অভিঘাত পরবর্তী দু-দশকের কথাসাহিত্যের ধারায় বহু পরিবর্তন ঘটিয়েছে। যে-কারণে তারাশঙ্কর-মানিক-বিভূতি-সতীনাথ ভাদুড়ী, অদ্বৈত মল্লবর্মণদের লেখায়, গায়ত্রী চক্রবর্তী বর্ণিত 'selfs shadow' বা উচ্চবর্গের ছায়াচ্ছন্ন অপরদের অতি সহজে চেনা যায়। এর পর সত্তর দশকের রাজনৈতিক অভিঘাত এক ধাক্কায় বাংলা সাহিত্যে এই 'অপর'দের সম্পূর্ণ অস্তিত্ববান করে তোলে। সত্তরের দশক মাটির সঙ্গে মানুষের বদলে যাওয়া সম্পর্ককে, কেন্দ্রের সঙ্গে প্রান্তিক মানুষের চলমান সম্পর্ককে নতুন ভাবনায় আবিষ্কার করল, প্রতিষ্ঠা করল। এই সময়ের অভিঘাত পাঠক-চৈতন্যে স্থিত হল, তার ব্যঞ্জনা নানামাত্রিক হয়ে উঠল। মহাশ্বেতা দেবী, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, ভগীরথ মিশ্র, অভিজিৎ সেন প্রমুখ ঔপন্যাসিকেরা ওপেন এনডেড প্রান্তিক বাস্তবতাকে তুলে আনলেন তাঁদের লেখায়। ফলে প্রান্তিক বাস্তবতার সম্ভাবনাময় এক অসমাপ্ত পরিসর খুলে গেল, প্রশস্ত হল। এই পথ ধরেই এলেন—তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত রক্ষিত, অমর মিত্র, নলিনী বেরা, আফসার আহমেদ, মানব চক্রবর্তী, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সোহারাব হোসেন, শুভঙ্কর গুহ প্রমুখের মতো কথাসাহিত্যিকরা।

রচিত হতে থাকল একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকের ভিন্ন আখ্যান 'ঔপনিবেশিক বিবেকের মহাসন্দর্ভ'। আমরা পেলাম ধ্বংসপ্রায় দেশজ ধারার পুনরুজ্জীবন। সাহিত্যে মিথ, অলৌকিকতা ও রূপকের স্পর্শ লাগল নতুন করে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক সংকটের ভেতরই উত্তর আধুনিকতার সম্প্রসারণ ও চেতনার বদল ঘটতে থাকল। উত্তর ঔপনিবেশিক বাস্তবতায় প্রান্তিক চেতনার ক্রমপ্রসারণশীল ভাষ্য স্থাপিত হল। সমালোচক বলছেন—

> ''আজ আমরা মালিকানাহীন উপনিবেশোত্তর পাঠবস্তু ও পাঠকৃতির কথা ভাবছি। সত্তর দশকের ঔপন্যাসিকরা যেন বা তারই সন্ধান দিয়েছিলেন। আধুনিক উপন্যাসে

> হিউম্যানিস্টিক চেতনার প্রতিফলন ঘটিয়ে শুধুমাত্র মানুষের মনোবীজকেই ধন্য করে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু উত্তর-আধুনিক উপন্যাসের ধারায় প্রান্তিকায়িত অ-মানুষের প্রাকৃতিক ঐকতানে গড়ে তোলা হয়েছে ভূমিসংলগ্ন বিদিশায় সাংস্কৃতিক নব্য সংগঠন আর সেই সঙ্গে আরও জরুরি ও প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে প্রান্তিক জীবনের আর্থরাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে নবজায়মান প্রাকৃতিক সংশ্লেষ ও সংযোগ।" [১]

একুশ শতকের প্রারম্ভিক দশকে কথাসাহিত্যের ধারায় আবার কিছুটা বদল আনতে সক্ষম হয়েছে। সত্তরের ঔপন্যাসিকদের প্রস্থানভূমি থেকেই সূচনা হয়েছে উপন্যাসের বিকল্প বাস্তব পাঠ নির্মাণের। এ এক নতুন সাহিত্যিক নির্মাণ, জায়মান সমাজবীক্ষা। সমালোচক বলেছেন—

> ''এ সময়ের আখ্যান তাই অন্তর্বস্তুতে ও প্রকরণে বড় অস্থির, বড় অনিশ্চিত এবং বেশ খানিকটা পুনরাবৃত্তিময়। সব ধরণের রৈখিকতা যেমন মুছে যাচ্ছে তাতে তেমনি ঘটে যাচ্ছে পুরাতনের নবনির্মাণও।" [২]

আখ্যানের শরীরে যেমন দেখা যাচ্ছে 'বস্তু ও সংকেতের কোলাজ' তেমনই আখ্যানের শরীর থেকে কাহিনি নির্মাণের চিহ্নও যেন আস্তে আস্তে মুছে যাচ্ছে। আজকে তাই ভাঙাচোরা প্রান্তিক, ব্রাত্য মানুষের আখ্যান ও কাহিনি বদ্ধ গণ্ডীর বাইরে এসে মুক্ত চেতনার আলোকে বিচরণশীল হয়ে উঠেছে। শক্তি ও সম্পদের নাগরিক সমাবেশে শ্রেণিবিভাজিত সমাজ থেকে বিচ্যুত মানুষ-প্রকৃতি-জীবজগৎ সে-মহাকাব্যিক আখ্যানপটে বিধৃত হয়েছে, সে-মুক্ত আলোকে উজ্জীবিত হয়েছে, তাদের সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্নতা সহ উপস্থিত হয়েছে, আচ্ছন্ন করে তুলতে সক্ষম হয়েছে পাঠকের সদাসচেতন অথচ আত্মমগ্ন বোধকে। এই অধ্যায়ে আমরা দেখাব একটা সময় যে বিষয়ের উপস্থাপন ছিল লেখকের সচেতন প্রয়াস তা অতি সাম্প্রতিকে এসে কীভাবে অতিস্বাভাবিক কাঙ্ক্ষিত বাস্তব ধারায় পরিণত হয়ে গেল।

প্রসঙ্গত কিছু উপন্যাসের আলোচনা করতে হয়। একটি তালিকাও উপস্থিত করা যায়—

টাঁড় বাংলার উপাখ্যান	২০০০	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৯৪৭)
বিপরীত যুদ্ধের মহড়া	২০০১	অনিল ঘড়াই	(১৯৪৭)
কুশকরাত	২০০১	সৈকত রক্ষিত	(১৯৫৪)
ধ্রুবপুত্র	২০০২	অমর মিত্র	(১৯৫১)
রূপাখ্যান	২০০৩	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	
পাতা ওড়ার দিন	২০০২	অনিল ঘড়াই	
মহারণ	২০০৩	সোহারাব হোসেন	(১৯৬৬)

সামনে সাগর	২০০৩	অনিল ঘড়াই	
সরম আলির ভুবন	২০০৪	সোহারাব হোসেন	
মহামাস	২০০৫	সৈকত রক্ষিত	
শবরচরিত	১৯৯৮-২০০৫	নলিনী বেরা	(১৯৫২)
প্রথম পর্ব	১৯৯৮		
দ্বিতীয় পর্ব	১৯৯৯		
তৃতীয় পর্ব	২০০০		
চতুর্থ পর্ব	২০০৫		
পূর্বগামিনী	২০০৫	অমর মিত্র	(১৯৫১)
রীতিকথা	২০০৫	তপন বন্দ্যোপাধ্যায়	
ঢুন্ডিয়া পাল	২০০৮	মানব চক্রবর্তী	(১৯৫১)
বিয়োর	২০১১	শুভঙ্কর গুহ	(১৯৫৬)

টাঁড় বাংলার উপাখ্যান, রূপাখ্যান, রীতিকথা

> ‘‘কখনও মনে হয় এই বিশ্বজগতের প্রতিটি মানুষই তো এক বা একাধিক উপন্যাসের সমন্বয় প্রতিটি জীবনই তো এক বিশাল সংগ্রামের ইতিহাস। ... আবার কখনও মনে হয় বিশ্বজগতের হাজারো জনগোষ্ঠীর প্রত্যেকটি নিয়েই তো লেখা যেতে পারে এক বা একাধিক উপন্যাস। তাদের জীবন যাপন আলাদা, মুখের ভাষা, কথনভঙ্গি, সামাজিক রীতিনীতি, সংস্কার, ধর্মীয় অনুশাসন সবই অন্যরকম। প্রতি পঁচিশ মাইল পর পর নাকি মানুষের মুখের ভাষা থেকে অনেক কিছুই বদলে যায়। সেই জীবনযাপন লেখা সম্ভব শুধু সেখানে বসবাসকারী কোনো লেখকের পক্ষে। কিন্তু লেখক তো এমন ভুরি ভুরি জন্মায় না। প্রতিটি জনগোষ্ঠীতেই এক বা একাধিক লেখক জন্মাবে তা ভাবা বাতুলতা। অদ্বৈত মল্লবর্মণ হয়তো একজনই জন্মায়। তাহলে কে লিখবে এত এত জনগোষ্ঠীর কথা।’’ [৩]

—এই তাগিদ থেকেই লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলম ধারণ, বোঝা যায় কোন কথা তিনি বলতে শুরু করবেন। নেশা ও পেশার সূত্রে তিনি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তবে ‘টাঁড়বাংলার উপাখ্যান’ এক প্রান্তিক জেলার গ্রামজীবনের বিশ্বস্ত দলিল। যে-গ্রামজীবন পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি প্রান্তিক গ্রামেরই প্রতিরূপ। টাঁড়বাংলা ট্রিলজি আবার টাঁড়বাংলা নিয়ে সম্পূর্ণ পৃথক তিনটি উপন্যাস—

টাঁড় বাংলার উপাখ্যান

টাঁড় বাংলার রূপাখ্যান

টাঁড় বাংলার রীতিকথা।

তিনটি আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন : তেভাগা, নকশাল, ঝাড়খণ্ড, এই আন্দোলনগুলিকে ছুঁয়ে গেছে উপন্যাস। তবে সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বৈচিত্র্যে টাঁড়বাংলার স্বতন্ত্র জীবনচর্যা-ই উপন্যাসের মুখ্যবস্তু।

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী মেদিনীপুর জেলার সঙ্গে লগ্ন হয়ে আছে উড়িষ্যা, বিহার, বর্তমানে ঝাড়খণ্ড। তিনটি প্রদেশের মিলন, সঙ্গমভূমি এই জেলা। সমুদ্র, পাহাড় জঙ্গলে ঘেরা, পাথুরে লাল মাটি। বর্ণহিন্দুর পাশাপাশি মুসলমানের বাস, আর আছে সাঁওতাল-মুন্ডা-ওঁরাও-লোধা শবর-খেরিয়া শবর প্রভৃতি আদিম জনগোষ্ঠীর বসবাস। ধান-ই তাদের প্রধান খাদ্যশস্য। টাঁড় বাংলার উপাখ্যানে খুব প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসেছে লোধা-শবরদের কথা। লোধাদের বিরুদ্ধে চৌর্যবৃত্তির অপবাদ অনেক পুরোনো। একজন পান্না কোটাল তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে সমস্যার সুরাহা হয় না। চুরি-ছিনতাই-ডাকাতির সঙ্গে বহুদিন ধরে জড়িয়ে আছে লোধাদের নাম। লেখক জানিয়েছেন—

> ‘‘...লিখতে গিয়ে এও বুঝতে পারি কোনও জনগোষ্ঠীকে উপন্যাসের পৃষ্ঠায় তুলে আনা খুবই কঠিন কাজ। মনে হল যতটুকু লিখলাম, তাদের সম্পর্কে না-লেখা অংশই বেশি। পরে আরও বিশদ ভাবে লিখব এই জনগোষ্ঠী নিয়ে এরকম ভাবনার ফুরসতে ঝাড়খণ্ড আন্দোলন উঠল তুঙ্গে। তখনই অন্য একটি উপন্যাসের বীজ পোঁতা হয়ে গেল বুকের কোথাও। টাঁড়বাংলার জীবনযাপন নিয়ে লেখা শুরু করি আর একটি বড় মাপের উপন্যাস। এই আদিম জনগোষ্ঠীর অনেকগুলো ভাগ। সাঁওতাল ছাড়াও আছে মুন্ডা লোধা, শবর খেড়িয়া, কোড়া—আরও কত আদিবাসী গোটা মেদিনীপুর জুড়ে। তাদের কথাও তো লেখা দরকার। ... বড়ো একটা ক্যানভাস বেছে নিয়ে শুরু করি বাংলার সীমান্তবর্তী এক জেলার ষড়রং নামের একটি ব্লক এলাকার জনগোষ্ঠীর জীবনযাপনের উপাখ্যান। সীমান্তবর্তী এলাকার কিছু অংশ এঁটেল মাটির, সেখানে ধানই প্রধান শস্য। কিন্তু মাটির রং লাল। সেখানে যেদিকে তাকাই শাল-সেগুনের গভীর জঙ্গল পাথুরে মাটিতে শস্য তেমন ফলে না। ফলে দারিদ্র্য ও বঞ্চনা। এখানে আছে আদিবাসীদের বসবাস। তাদের কাছে এই বিংশ শতাব্দীর শেষে বা একবিংশ শতাব্দীর প্রথমেও সভ্যতা বহু আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু তাদের গভীর জীবনবোধ আমাকে ভাবায়, অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করে। তাদের প্রাণ প্রাচুর্য আমাকে তাদের সম্পর্কে নতুন করে চেনায়।” [৪]

টাঁড় বাংলা গ্রামীণ অন্তজ জীবনের আর এক ধারাবাহিক বিবর্তিত ইতিহাস। গ্রামীণ জীবনের

প্রাত্যহিক নানান জটজটিলতা নিয়ে মানুষগুলি চিত্রিত, তার সাথে রাজনৈতিক টানাপোড়েন। লেখক উপন্যাস শুরু করতে যাওয়ার আগে বলে নিয়েছেন

টাড় বাংলার কথা গরল সমান।
মন্থন করে করো অমৃত সন্ধান।।

গ্রামীণ জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে রাজনৈতিক ঘোঁট ক্ষমতা দখলের লড়াই সর্বত্র। ১৯৮৪ সাল থেকে টাঁড়বাংলার উপাখ্যান শুরু হয়েছে। সত্তর দশকের গ্রামীণ রাজনৈতিক বদলকে দেখানো হয়েছে উপন্যাসে। পঞ্চায়েত প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত রাজনীতি গ্রামজীবনের নিয়ন্ত্রক শক্তি। গ্রামবাংলার চিত্র আঁকতে গিয়ে লেখক দেখালেন গ্রামবাংলার রূপ এখন আর বিভূতিভূষণ, জীবনানন্দের রূপের সঙ্গে মেলে না। সেখানকার জীবনযাপনে এখন অনেক বদল ঘটে গেছে। উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে ষড়রং বলে একটি জায়গা। প্রথম খণ্ডে আছে পঞ্চরং এর প্রসঙ্গ। কাহিনিপটে এসেছে বহু উপকাহিনি বহু ঘটনা। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার নির্বাচন প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি বর্ণনা উঠে এসেছে গ্রামে দোপাটির পঞ্চায়েত সদস্য হওয়া নিয়ে বিরোধ প্রসঙ্গে। আর বিস্তৃতভাবে মামলা প্রসঙ্গ, গ্রাম-জীবন ছাড়িয়ে উপন্যাসটিকে বিস্তৃতি দিয়েছে। তবে এই আখ্যানে নায়ক/নায়িকার ভূমিকা গৌণ। এলাকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের বৈচিত্র্যই উপন্যাসের প্রধান উপাদান। পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার, রাজনৈতিক দ্বিধাবিভাজন আর গ্রামজীবনের বদল দেখানোই উপন্যাসের প্রধান উদ্দেশ্য।

বদলে গেছে জমিদার/ভূস্বামীর সংজ্ঞা। এখন জমিদার জমি হারিয়েছে, বর্গাদার জমি পেয়েছে তাই উভয়েই সমবিন্দুতে অবস্থিত। এই পরিবর্তনের চিত্র অংকন তখন জরুরি হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে লেখক দেখিয়েছেন—ঝাড়খণ্ড আন্দোলনের তীব্রতা আর সাঁওতাল লোধাদের বিচিত্র জীবনযাত্রা, উৎসব, পরব এর জীবন্ত ছবি। তৃতীয় খণ্ডে গ্রামবাংলায় পঞ্চায়তি ব্যবস্থায় নারীসমাজের ক্ষমতায়নের রাজনীতি বর্ণিত। গত সাত বছরের পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান, বেশি মাত্রায় সক্রিয় অংশগ্রহণ, এইসব উপন্যাসের তিনটি পর্বের নায়িকা দপাটির সাধারণ এক গৃহবধূ থেকে গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান হিসাবে উত্তরণের মধ্যেই বর্ণিত। আর অন্য দিকে প্রান্তিক অন্তজ নিম্নবর্গের জীবনচিত্র, সেখানে আদিবাসীরা যেমন আছে তেমনই বন্যায় আক্রান্ত শিশুরঞ্জন পালের ঝুপড়ির খবর। ত্রাণের আগেই যেখানে পৌঁছে গেছে রিপোর্টার। মিডিয়ার দৌলতে বন্যাদুর্গতদের নিয়ে অন্য রাজনীতির খেলা। সেখানে একটা সিগারেটের বিনিময়ে হয়তো শিশুরঞ্জনের মতো অনেকেই ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে প্রস্তুত। নিয়মমাফিক বন্যা এখানে, প্রতিবছর তাই জেলার খবর তুলে আনার দায়িত্বও তো মিডিয়ার। আর কিছু না হোক একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্যের জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা তো তাদের আছে। সে-কাজেই শিশুরঞ্জনের স্ত্রীকে প্রস্তুত করতে তারা ব্যস্ত। বন্যা পরিস্থিতি

দেখতে নেতাদের আগমন, আর শিশুরঞ্জনের ন্যাংটো কন্যা পুঁটের মন্তব্য—'আচ্ছা বাবা রোজ বছর বন্যে হয় না কেন, তাহলে তো বেশ দুবেলা কত কত খাবার পাওয়া যেত'। বোঝা যায় রোজই যেখানে ত্রাণ পৌঁছানো জরুরি সেখানে বন্যার দিনগুলো সুদিন বলে বিবেচিত। এ বাস্তবচিত্র তুলে ধরাটা দায়ভারের মতো লেখক কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন বলেই টাঁড়বাংলার মতো তিনটি উপন্যাসে বিবৃত হয়ে থেকে গেল অজানা, বা না জানতে চাওয়া ইতিহাসের কিছু ধারাবাহিক, কিছু টুকরো ঘটনা, আলগা ছবি। লেখক বলেছেন—'এই ট্রিলজিতে আমি ধরতে চেয়েছি এই মুহূর্তের গ্রামবাংলার হৃদস্পন্দন।'

সৈকত রক্ষিত : মহামাস

> ''... আমার দেখা সমাজের মনুষ্যেতরদের জন্য সর্বত্যাগী হতে না পারলেও যদি একদন্ড তাদের জন্য কাঁদতে পারি, তাহলেও আমার জীবন ধন্য হবে, ... আমার মধ্যে, শিক্ষা ও চেতনার অর্থে, যেটুকু অন্তর্দৃষ্টির উন্মেষ ঘটেছে, তা সম্ভব হয়েছে আমাদের অভাবনীয় পারিবারিক জীবনের দারিদ্রের মধ্যে থেকে বেড়ে ওঠার কারণে। শৈশবে এমন দিনও গেছে, যখন শুধুমাত্র সজনে পাতা মাটির খাপরিতে সেদ্ধ করে সপরিবার খেয়ে থাকতে হয়েছে। ... এই প্রতিকূল পরিবেশ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি দারিদ্র্য, অনাহার, অপমানকে চিনতে শিখেছি আর তার সূত্রেই চিনেছি মানুষকে, সমাজকে। ... আমি যদি ঈশ্বর বিশ্বাসী হতাম, তাহলে ঈশ্বরকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দিতাম আমাকে দারিদ্র্যের অন্ধকার দিয়ে জীবন ও জগতের প্রকৃত রোশনাই দেখানোর জন্য। এই দারিদ্র্য থেকে আমার মধ্যে শ্রেণীচেতনার জন্ম হয়েছে। আবার এই থেকেই আমার মধ্যে অটুট মনোবল, গভীর অধ্যবসায়, অভাবনীয় সহনশীলতা এবং সর্বোপরি তীব্র অভিনিবেশ তথা পর্যবেক্ষণশীলতার উদ্ভব ঘটেছে। এই দারিদ্র্যই বিচারের মুহূর্তে সর্বদা আমাকে বিবাদীপক্ষের দিকে ঠেলে দেয়। অপেক্ষাকৃত দুর্বলের হয়ে অংশ নিতে বলে।... অগণিত দারিদ্র্য পীড়িত, অশিক্ষিত, বিবর্ণ-অপমানিত মানুষজন আর গ্রামে গ্রামে লোকশিল্পী-ছৌ-ঝুমুরশিল্পী, নাচনী-রসিক-নাটুয়াদের নিয়ে এক মহাসংসার পেতে ফেলেছি আমি।'' [৫]

লেখকের শিল্পীসত্তার জন্ম যখন হয় এই উপলব্ধির জগৎ থেকে তখন পাঠকের বুঝে নিতে দেরি হয় না তাঁর কলম কী বলবে? কাদের কথা বলবে। লেখকের এই 'প্লাস ওয়ানের' ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস আকরিক থেকেই। লেখক বলেছেন—

> ''সেসময় বাসে উঠলেই একটা লেখা চোখে পড়ত ৩০+১ কিংবা ৩৬+১। এখন ভাবতে অবাক লাগে এই তুচ্ছ লেখাটি লেখক হিসাবে আমার জীবনদর্শনকে পুরোপুরি পাল্টে দিল। আমার ভাবনা বা সংকল্পের মধ্যে যাবতীয় যা খাদ ছিল, তার সবই ধুয়ে মুছে দিয়ে আমাকে আত্মস্থ করে তুলল একটা লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য।

> মনে হলো, কেবল ভালো লেখা লিখলেই হবে না, আমাকে এমন লেখা লিখতে হবে, যা ওই ৩৬ জনের ভিড়ে হারিয়ে যাবে না, আমাকে 'প্লাস ওয়ান' হতে হবে। এই সংকল্পে আমি আজও অনড় এবং অটল আছি।" [৬]

আকরিক (১৯৮৪) উপন্যাস পুরুলিয়ার হতদরিদ্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরির শ্রমিকদের জীবনচিত্র। চুনাপাথরের খাদান কেটে সরকারি উদ্যোগে সিমেন্ট কারখানা গড়ার কাজে ঝালদার কাছে ব্রজপুর হেঁসহাতু অঞ্চলের গ্রামীণ মানুষের জীবন ও জীবিকাকে লেখক গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন। এই বিচ্ছিন্ন স্থানে সিমেন্ট কারখানা গড়ে ওঠার ফলে স্থানীয় জনজীবনে যে প্রভাব পড়েছিল তারই ডকুমেণ্টারি এই উপন্যাস। সৈকত রক্ষিতের বেশির ভাগ উপন্যাসেই আছে 'ডকুমেন্টেশন'। এ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন

> ''কেবল পরম্পরায় সাজানো ঘটনা নয়, চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও না, সেই সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো 'ডকুমেন্টেশন'। বলা যায় এই ডকুমেন্টেশনকে ভিত্তি করে ইমারতের মত দাঁড়িয়ে থাকবে উপন্যাস।" [৭]

জীবন ও জীবিকার জন্য পাথর কাটাকে সম্বল করে মানুষগুলির প্রাণপণ সংগ্রামের কাহিনি। প্রতিরোধী শিক্ষাহীন, শক্তিহীন সম্বলহীন মানুষগুলি খুব সহজেই সরকার আর ঠিকাদারের প্রচেষ্টায় স্বভূমিচ্যুত হয়। তবে প্রয়োজনে একটা সময় এই দুর্বল অসহায় মানুষগুলিই বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। একসময় এদের ভেতরেই জন্ম নেয় প্রতিরোধের শক্তি, সঙ্ঘবদ্ধতার শক্তি, শ্লোগান— 'ফেকটিরিয়ে কাম দাও/সুবন্ন র‍্যাখায় বাঁধ দাও।/চৈল্য সব লিত ভখার দল। বুধাপাল হাতের টাঙি স্বর্গে ছুঁড়ে বলে 'চলৌ পুরুইলা' কিম্বা—'সব কামিয়ার এক রা/ঠিকাবাবু নিকাল যা। এভাবেই লেখা হয়ে গেল এক প্রান্তিক মানবগোষ্ঠীর রাজনৈতিক শ্লোগান আর প্রান্তজনের জীবন সংগ্রামের আখ্যান।

অক্ষৌহিণী (১৯৯৬) ইঁটভাটার খাদিয়াদের জীবন-সংগ্রামের আর এক আখ্যান। এভাবেই একের পর এক লেখা হয়ে যায় 'হাড়িক', 'ধূলাউড়ানি', বৃংহণ, সিরকাবাদ, কুশকরাত, সিঁদুরে কাজলে, মদনভেরি, মহামাস-এর মতো উপন্যাস। শবর, সাঁওতাল, বাউরি, কুরমি, আদিবাসীদের সঙ্গে আছে বিভিন্ন উপজীবিকার মানুষ। কারিগর, শাঁখারি, শূকর পালক, তুলো সংগ্রাহক, ঝুমুর নাচনি, আদিম বাদ্য যন্ত্র বাদক (ঘাসিরা) এই সকল জনগোষ্ঠী তাঁর উপন্যাসের চরিত্র। পীড়িত, অশিক্ষিত, বিবর্ণ অপমানিত মানুষজনই তাঁর সাহিত্যিক অবলম্বন। ইঁটভাটার শ্রমিকদের নিয়ে যেমন লিখেছেন 'অক্ষৌহিণী' তেমনি আখচাষীদের নিয়ে 'সিরকাবাদ', পুরুলিয়ার জলসমস্যা নিয়ে 'ঢেঁকিকল', শূকর পালক সহিসদের জীবনকথা নিয়ে 'হাড়িক' (১৯৮৭)। এই জনগোষ্ঠী ভদ্রসমাজের কাছে অপাঙক্তেয়, ব্রাত্য। শিষ্ট সমাজের কাছে অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য। গো-ভাগাড়,

আস্তাকুঁড়, জলাজমি, পাতা খড়ের ছাউনি দেওয়া ছোট মাটির বাড়ি এসব নিয়েই গড়ে উঠেছে পুরুলিয়ার মানবাজারের হাড়িপাড়া যেখানে স্কুল নেই, বিদ্যুৎ নেই, যাতায়াতের পথও নেই অগৌরবের জীবিকার অবলম্বন পশুগুলি নিয়েই তাদের বাঁচা। যদিও অতীতে তারা রাজার আস্তাবল দেখাশোনার কাজ করত, ঘোড়ার পরিচর্যা করত। এখন আলোহীন কুঁড়েঘরে শুয়োর প্রতিপালনই তাদের জীবন ও জীবিকা। তবে পশুগুলিও তাদের নিজস্ব নয়। মানবাজারে যাদের কাঁচা পয়সা আছে তারাই এই ব্যবসা চালায়। শুয়োর কিনে হাড়িদের দেয় আধাআধি হিসেবে। হাড়িরা ভাগ-চাষী তারা কেবল শুয়োর প্রতিপালন করে। এভাবেই তাদের হতশ্রী, ভীতু, পরনির্ভর জীবন বয়ে চলে কালের নিয়মে, যখন সময়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারে না তখন আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হয়।

শোষণের শিকড় সন্ধান করে লেখক পৌঁছে গেছেন একেবারে সমাজের নিম্নতলে। একদিকে হাড়িদের সমাজ অন্যদিকে সভ্যমানুষদের সমাজ। হাড়িদের জীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনা লেখক করেছেন। গুহিরাম মাংস বিক্রি করে, শুয়োরের রোঁয়াও বিক্রি করে। শুয়োরের সঙ্গে থাকতে থাকতে এই মানুষগুলিও অনেক সময়েই যেন তাদের মানবিক স্বভাব বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হয়েছে।

> ''গুহিরাম সারাটা দিন শুয়োর তাড়িয়ে বেড়ায়। খটখটে রোদেও তার ছোটাছুটির বিরাম নাই। কোমরে আঁট করা লুঙ্গি, হাঁটুর তলা থেকে ফর্দাফাই। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তার। শুয়োরের সঙ্গে থেকে, তাদের লালন করতে করতে সে নিজেও কেমন জংলী হয়ে উঠেছে।''

আর আছে হাড়িদের ন্যাংটো ছেলেমেয়েগুলি ও বউদের ধাইয়ালির বিবরণ। দুপয়সা কামানোর জন্য হাড়িরা নিজেদের শরীরকে ফেরি করে বেড়ায়। ধান কাটার সময় তাদের ডাক পড়ে। খুব কম মজুরিতে ওদের খাটিয়ে নেওয়া যায়, আবার ওরা খুব বিশ্বস্তও। লেখক এখানে ভোটের রাজনীতিকেও তুলে এনেছেন—

> ''মাত্র বারোটি ঘর নিয়ে সহিসদের এই পাড়া। বারোটি ঘরে বাসিন্দার সংখ্যা জনাপঞ্চাশেক। ভোটদাতা ৩২। সমগ্র মানবাজার থানার ভেতরে তা এতই ক্ষুদ্র ও নগণ্য যে সহিসদের এই লোকালয়কে আলাদা কোনো গ্রাম ধরা হয় না। বলা হয় হাড়িপাড়া।''

সভ্যসমাজের ভোট-রাজনীতি আর তার প্রান্তিক প্রতিক্রিয়াকে লেখক সুনিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। পঞ্চায়েত প্রধানের ছদ্ম আন্তরিকতায় ও জাঁকজমকে তারা বিরক্ত আবার এতদিনের দাসসুলভ হীনমন্যতাকে গোপন করে ঈষৎ ঔদ্ধত্যও দেখায়। বঞ্চিত মানুষগুলি বেঁচে থাকে তাদের পালিত পশুগুলির মতো করেই—

> ''বৃহত্তর অর্থে এই সুন্দর 'সুশৃঙ্খল' সমাজটাকেই তাদের কাছে একটা 'ছাড়ঘর' যেখানে তারা নিরুপায় আটক। সমাজে বৃত্তি বিভাজনের মতো একটা সুপ্রাচীন ও উদ্দেশ্যমূলক চক্রান্তকে সত্য মেনে নিয়েও যদি ধরে নেওয়া হয়, শুয়োর প্রতিপালনই তাদের শেষ এবং একমাত্র জীবিকা... তাহলে সে-জীবিকার ক্ষেত্রেও উদাসীন মনোভাব রয়ে গেছে সরকারের,... কিন্তু সরকারের ঔদাসীন্য কি কেবল শুয়োর চাষেই সীমাবদ্ধ? এখানে আলো নেই, শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্য নেই। অথচ মানুষ আছে।''

এই বঞ্চনার বিরুদ্ধে একসময় হাড়িদের মনগুলিও বিষিয়ে ওঠে। ওরা উত্তেজিত হয় এবং সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নিতেও সক্ষম হয়। তারা দাবি তোলে—

> ''হাড়িদেরকেও লোকদীপ প্রকল্পের সুযোগ দিতে হবে।/পানীয় জলের জন্য দিতে হবে অন্তত একটি নলকূপ।/শূকরচাষের আধুনিকীকরণ করতে হবে। এবং তার জন্য সরকারী সাহায্য, লোন ও পশুখাদ্য আবশ্যক। পাঁঠার মাংসের মতোই শূকর মাংস প্রকাশ্য বাজারে বিক্রির অনুমতি দিতে হবে। হাড়িদেরও দিতে হবে শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা।''

পুরুলিয়া-বাঁকুড়ার সীমান্তবর্তী হাটগ্রামের শাঁখারিদের জীবন-সংগ্রামের বাস্তব কাহিনি কুশকরাত (২০০১)। বেঁচে থাকার দুর্মর প্রয়াসই তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে। 'শুধু বেঁচে থাকাটুকু ছাড়া জীবনের কাছে এদের আর কোনও দাবি নেই। এদের পর্যাপ্ত আহার নেই, বাসস্থান নেই, বিশ্রাম নেই, শান্তি নেই, আনন্দ আহ্লাদ-হর্ষ নেই। কেবল জীবনটুকু আছে'। এ উপন্যাসের কাহিনি রচনা করতে গিয়ে শাঁখারিদের যে বাস্তব জীবনের সঙ্গে লেখক পরিচিত হয়েছিলেন সে-প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন—

> ''কুশকরাত লেখার সময় শাঁখারিদের গ্রামে যে-জীবন আমাকে অস্থির ও আলোড়িত করে তুলেছিল, তার মর্মন্তুদ জীবনেতিহাস কোনদিন ভুলতে পারবো না। মাত্র কয়েকটি পয়সা রোজগার করার জন্য শাঁখারি শিশু থেকে বৃদ্ধার কি অসহায় সংগ্রাম! বাঁকুড়ার হাটগ্রামে আমার আত্মীয়-কুটুম্ব আছে লেখার সময় আমি সেখানেই ছিলাম। এই গ্রামের প্রায় সব পরিবার শঙ্খজীবি তারা বস্তাভর্তি দুর্গন্ধময় শাঁখ থেকে তৈরি করছে ঝকমকে শাঁখা, আংটি থেকে শুরু করে নানান অলংকার। ঘরে ঘরে সারাদিন এমনকি রাতেও কোনো বিরাম নেই, কিন্তু রাজনীতি আছে। কি অবহেলা! জীবনের কি চূড়ান্ত অবমাননা! কি অপ্রতুল এবং অসহনীয় এই বেঁচে থাকা, যা চোখেও দেখা যায় না। যেন কোনো কর্মচঞ্চল জীবনোদ্যোগে নয়, আমি শোকস্তব্ধ বধ্যভূমিতে আছি।'' [৮]

'মদনভেরি' পুরুলিয়ার বিলুপ্তপ্রায় ঘাসিরা সম্প্রদায়কে নিয়ে লেখা উপন্যাস। এই ঘাসিরা সম্প্রদায়ের জীবন-সংগ্রামের সূত্রেই পুরুলিয়ার ভয়ংকর খরার চিত্র মর্মস্পর্শী ভাবে অঙ্কিত হয়েছে। ঘাসিরা সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষদের বৃত্তি ছিল মদনভেরি বাজানো। জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ কেন্দ্রিক উৎসব

আয়োজনে এদের ডাক পড়ত। এই বিস্ময়কর পেশার সঙ্গে যুক্তজনগোষ্ঠীর জীবন-সংগ্রামকে তুলে ধরার সূত্রেই লেখক বলেছেন—

> ''উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিরাট আদিম বাদ্যযন্ত্রটি উর্দ্ধমুখী বাজিয়ে স্বর্গের দেবতাদের জানিয়ে দিত মর্ত্যলোকে কোন্ নবজাতকের আবির্ভাব ঘটলো অথবা কার তিরোধান। তার বিনিময়ে দু-পাই অন্নদান, একছিটে বস্ত্রদান।''

এই তাদের জীবন।

মানভূম-পুরুলিয়ার বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণির মহিলাদের জীবন চিত্রই 'সিঁদুরে কাজলে' উপন্যাসের উপাদান। সভ্য সমাজের কাছে এরা ঘৃণ্য নাচনী। মূলত কুড়মি সমাজকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এ কাহিনি। যাদের পদবী মাহাতো, বাঁশিরিয়ার, কেশরিয়ার, মহান্ত ইত্যাদি। তবে লেখক বলেছেন—

> ''কেবল কুড়মি বা বাউরি নয়, আমার লক্ষ্যই হলো সাবঅলটার্নদের নিয়ে লেখালিখি। এই সীমিত জনগোষ্ঠীগুলির ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ধারা এবং বাঁচার দুর্মর প্রয়াসকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসা।'' [৯]

সৈকত রক্ষিতের উপন্যাস—জগৎ আসলে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তিক জেলা পুরুলিয়ার নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনদর্পণ। বেশিরভাগ উপন্যাসের মূলে আছে বিচিত্র সব উপজীবিকায় যুক্ত মানুষজন। তেমনই একটি উপন্যাস 'মহামাস' (২০০৫)। বর্তমানে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রভাব মানুষের জীবন থেকে প্রতিমুহূর্তে কেড়ে নিচ্ছে বিভিন্ন জীবিকা, জীবিকা ক্ষেত্রে মানুষের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। 'মহামাস' উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন 'লম্প' এই আলোকবর্তিকাটি যারা তৈরী করে যাদের জীবনের সঙ্গে এই লম্পশিল্পটির ওতপ্রোত যোগ আছে কীভাবে সভ্যতার প্রয়োজন সাপেক্ষে এই উপজীবিকার মানুষগুলির জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হচ্ছে। হাড়ের মালার মতো গলায় ঝুলে থাকা একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে আট ঘরের বাসিন্দা লম্প তৈরির শ্রমিকরা কী কঠিন অভাবের সঙ্গে দারিদ্র্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেঁচে আছে।

'জয় ভোলানাথ ভাণ্ডার'-র সাইনবোর্ড লটকানো আটঘরের বাসিন্দারা অতি ভোরে সারাদিনের ক্লান্তিভারাক্রান্ত ঘুম-ভার শরীরটাকে জোর করে জাগিয়ে তুলে শুরু করে দেয় টিন কাটা আর 'হাতুরির টাঁই টক্কর'এর কাজ। এক উঠোন ঘিরে আট আটটা পরিবার। কম করে হলেও এক একটি পরিবারে তিন চারটে সন্তান। 'বউমানুষ'গুলি ভারি পেট নিয়েই 'মরদ'গুলোর মতই পরিশ্রমী। আটঘরের একটি পরিবার ছটু ও চারি-র তাদের পাঁচ সন্তান জগ্‌দীশ, দীপক, রঞ্জিত, সদা আর অশ্বিনী। এতগুলো পেট চালাতে শুধু লম্প তৈরিই নয়, ছটুকে যেমন করতে হয় টিন ঝাল দেওয়ার কাজ চারিকে সুপুরি কাটা, ঠোঙা তৈরি। যদিও আটঘরের সকল মেয়ে-পুরুষ বড়

ছেলেমেয়েরা লম্প তৈরি থেকে ঠোঙা বানানো বা সুপুরি কাটার কাজে হাত লাগায় যে যার সুবিধা মতো।

> ''লম্প গড়ার অবসরে এরা যে আর কিছুই করে না, তা নয়। তেল-গুদামে বসে থেকে ভর্তি টিন ঝালাই করা, কিংবা মেয়ে-বউদের দিয়ে সুপুরি কুচনো বা কাগজের ঠোঙা করিয়ে নেওয়ার মধেযও তারা রুজিরোজগারের চেষ্টা চালিয়ে যায়। অকাল তাদের এমনই অফুরান যে শুধু ভান্ডারের কাজ করে, লম্প গড়ে তারা স্বনির্ভর হতে পারে কই।''

অন্ন উপার্জনের জন্য সকাল থেকে রাত্রি অবধি পরিশ্রম তাদের করতেই হয়। এর ভেতর থেকে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও লেখাপড়া ছেলেমেয়েদের বেশিদূর গড়ায় না। ওই স্কুল পর্যন্ত তাও দশ ক্লাস পর্যন্ত নয়।—

> ''যে যত খাটবে, সে ততো লম্প বানাবে। হাতে পয়সাও পাবে তত বেশি। দারিদ্রের সঙ্গে সঙ্গে খাটাখাটুনির এই শর্ত তাদের মধ্যে শিশুর শ্রমকেও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে। ছুটুর কথা বাদ দিলেও কেতু বা মদন দাস—সবার ঘরে দুটো-একটা ছেলে ইস্কুল যাওয়া বন্ধ করে এখন লম্প গড়ছে। তাই নিয়ে ছুটু মাঝে মাঝে দু-কথা শুনিয়েও দেয়। বলে, 'তরা কেমন ধারার য্যা মানুইষ ছ্যেলাগুলার পড়া-ল্যাখ্যাটা চৌপাট করে দিছিস? বকা লোকের ই-দুনিয়ায় কী মুরাদ আছে?'' [১০]

এ বোধ সত্ত্বেও ছুটু তাল রাখতে পারে কই? চেষ্টা ও ইচ্ছা সত্ত্বেও তাকে হার মানতেই হয় অভাবের কাছে। এই আটঘরের লম্পশিল্পী বাসিন্দারা ছাড়াও এখানে জল নিতে আসা রামধনিয়ার সঙ্গেও পাঠকের পরিচয় হয়। 'বড় ধরমশালার সামনে এসে গোবচু আলু কাটা বিক্রি করে' আরও অনেক পেশার মানুষের উল্লেখ উপন্যাসে আছে। পান দোকানি, চা দোকানি, মুদি দোকানি। তবে বিশদে বর্ণিত হয়েছে লম্প কারিগরদের জীবনযাত্রা। পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণিত হয়েছে লম্প তৈরীর পদ্ধতি।

> ''এই আটটা টিনের টুকরো নিয়ে নিচেকার তেলের পাত্র আর ওপরের সলতে পরানোর সরু নল—এই দুটো অংশ করে নিলেই লম্প হয়ে যায়। তারপর পাত্রে সামান্য তেল, নলের মধ্যে একটা পাকানো কানি ছেঁড়া ঢুকিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়। তখনো অপেক্ষা থাকে স্রেফ একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের। তাহলেই জ্বলে ওঠে আলো। বলা যায়, সেই আলোর জন্য বহু হাতের খণ্ড খণ্ড প্রয়াস। বহু ঘাম আর রক্ত। বহু শরীরের ক্রমশ কংকালসার হয়ে যাওয়া।'' [১১]

তবে নিজেদের তৈরি জিনিস নিয়ে এই মানুষগুলির কোনো আবেগ নেই। কারণ তারা তো শিল্পী নয় নিছকই শ্রমোপজীবী মানুষ। শহরে গোটা দশেক মুদির দোকান আছে যেখানে লম্প

কেনাবেচা হয়। তবে শহরের চেয়ে নিকটবর্তী গ্রামগুলোতেই লম্প-র চাহিদা বেশি। আগে শহরেও লম্পর চাহিদা ছিল বৈদ্যুতীকরণের ফলে সে-চাহিদা কমেছে। মফস্বল শহরে এখন খুব সহজে জেনারেটারের লাইন ভাড়া পাওয়া যায়, লম্প ডিবরির চাহিদা তাই কমতে থাকে। তবে গ্রামের শত সহস্র বঞ্চিত মানুষ যারা সরকারি আলো এখনও চোখে দেখার সুযোগ পায়নি তাদের কুটিরে তো লম্প জ্বলতেই হয়। ছুট্টুদের লম্প বিক্রি আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে। যদিও সরকারি অনুদানে কমদামে মাল কেনার সুযোগ কারিগররা পায় তবুও বাজার দরের সঙ্গে লাভ রাখতে পারে না। বাজারে টিনের দাম খুব চড়া, সরকারি বরাদ্দে অপেক্ষাকৃত কম দামে এক টন করে টিনের ফালি চারমাস অন্তর তারা পায়।—তবুও নিজেদের খাটাখাটুনি বাদ দিলেও তার সঙ্গে আনুসাঙ্গিক রং ইত্যাদির দাম ধরেও একটা লম্পতে ছুট্টুরা লাভ রাখতে পারে না। এভাবেও আরও কিছুদিন লম্প বানানোর পর আস্তে আস্তে সে-কাজও স্তব্ধ হয়ে যায় একদিন। কারবার তারা চেষ্টা সত্ত্বেও ধরে রাখতে পারে না। টিন, কয়লা-কেরোসিন, রং, অ্যাসিড, অন্যান্য দাহ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম ওদের ক্রয়-ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। কিন্তু লম্পর মূল্য বৃদ্ধি হয় না। কারণ এখন আর সেটা অপরিহার্য নয়। ফলে খুব দ্রুত ওদের জীবনযাত্রার মানও পাল্টে যায়। অভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাস করে বিষণ্ণতা ও নৈরাশ্য। তবুও মানুষকে সব বিপন্নতারই সম্মুখীন হতে হয়। 'সময় ও বিপন্নতার কাছে মানুষের পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করা চলে না'। তাই আপ্রাণ চেষ্টায় তারা তাদের রুজিরুটির ক্ষেত্রটিকে সময়োপযোগী করে বদলে নিতে চেষ্টা করে। একদিকে পেট আর একদিকে সময়, এই দুয়ের বোঝাপড়া করতে না পারলে তো তারা টিকে থাকতে পারবে না। তাই—

> ''দিন চার পাঁচ হলো ছুট্টু তার ঝালাই করার ছোট তোলা-উনুনটা নিয়ে রাস্তার ধারেই বসেছে। ঠিক তার ঘরে ঢোকার গলির মুখটায়। সেখানে সে দুটো চারটে করে ভাঙাভাঙি বালতি ইত্যাদি মেরামত করে।''

তেল ভর্তি টিনের মুখ ঝালাই করতে ছুট্টুর ডাক পড়ে কেরোসিন ডিলারের মালিক মহাবীরের বাড়িতে। সরকারের তেল রেশনে বিক্রি না করে ঘরে মজুত করে রাখে মহাবীর। তারপর লরি ভর্তি সরষের তেলের সঙ্গে কেরোসিনের টিন ঢুকিয়ে রাতারাতি লরিভর্তি করে পাচার করে বিহারের যেসব অঞ্চলে জ্বালানি তেলের হাহাকার সেখানে পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত সে। আবার অতিরিক্ত দামে পেট্রোলপাম্পের মালিকদেরও কেরোসিন বিক্রি করে, পেট্রোলের সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে কেমিক্যাল দিয়ে চুরি ঢাকা হয়। তবে লেখক দেখিয়েছেন মহাবীরের এসব কাজের পেছনেও আছে অপরিসীম দারিদ্র, তার মুদির দোকান লক্ষ্মীভাণ্ডার বন্ধ হয়েছে মূলধনের অভাবে, সংসার অচল তাই সে এই রাস্তা বেছে নিয়েছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পুলিশের চোখ এড়িয়ে কেরোসিন পাচার করে মহাবীর রাতারাতি তিনটাকাকে তিরিশ টাকা করতে চায়। বাড়িতে তার

কন্যাসন্তান আছে। ছুটু মহাবীরদের মতো নিম্নবর্গের মানুষগুলির কাছে কন্যাসন্তান আর এক বিড়ম্বনা। কন্যার বিয়ে দিতে তাদের সাধ্যাতীত পণ দিতে হয়। ফলে, অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী, গলায় কন্যাদায়ের ফাঁস থাকলে ঘটি বাটি বন্ধক দিতে হয়।

দিন দিন ছুটুদের জীবনযাত্রার মান হয়ে যাচ্ছে নিম্নগামী। বাজার দর বাড়ার অনুপাতে তাদের মতো তৃতীয় স্তরের মানুষের পরিশ্রমের জন্য আয় তেমন বাড়েনি। একদিকে শ্রমের অবমূল্যায়ণ অন্যদিকে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ভারসাম্যহীন মূল্যবৃদ্ধি এই দুয়ের মধ্যে পড়ে ওরা দিশেহারা। তবুও কোনরকমে জোড়াতালি দিয়ে পেটের ভেতর অনিবার্য ক্ষুধা আর বুকের ভেতর পুঞ্জীভূত ক্রোধকে দমন করে রাখে। যাপিত জীবনের গ্লানি নিয়ে অস্পৃশ্যের মতোই বেঁচে থাকে। জীবন যাপনের যন্ত্রণাকে ভোগ করে চলে নিত্যদিন।

> ''নিজস্ব অভিজ্ঞতা দিয়ে ছুটুও বুঝতে পারে, বৃত্তির ভাগাভাগি মানুষকেও রীতিমত চাতুর্যের সঙ্গে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তার অর্থনৈতিক অবস্থাকে। যার ফল তারা কয়েক প্রজন্ম ভোগ করে চলেছে। ... বিভেদসৃষ্টিকারী, সংস্কারাচ্ছন্ন ... একপেশে নির্দেশাবলীর ভাবাদর্শে যে সমাজ গড়ে উঠেছে, সে সমাজ পুরুষানুক্রমিকভাবে ছুটুর মতো মানুষকে ক্ষমতাশালী একপেশে মানুষের যূপকাঠে ফেলে দিয়েছে। এখন ঘুণ ধরেছে সেই সামাজিক কাঠটিতে...।'' [১২]

হয়তো নন্দ-লীলাবতী, গুলোপা, পশুপতি, করুণা-ভীমা সকলেই এ ঘুণধরা সমাজ থেকে একদিন খসে খসে পড়ে যাবে বড় অসময়ে। কারণ ওদের জীবন হল ওদের কাছে 'রোজ বাঁচা, রোজ মরা'। নিরাপত্তাহীন, সংকটময় বিভ্রান্ত জীবনে নিম্নবিত্ত প্রান্তিক এই মানুষগুলির কাছে টিকে থাকাটাই সবচেয়ে বড় সমস্যা। বেঁচে থাকতে প্রত্যেকেই তাই কঠোরভাবে রোজগারের পথে নেমে পড়ে। দুর্নীতিপূর্ণ ধান্দাবাজের আখড়ায় প্রত্যেকেই তাই নিজের নিজের ধান্দার পথ বেছে নিতে হয়, স্বার্থপরের মতোই। পশুপতির মতোই তাদের সকলকে একদিন না একদিন জীবিকা বদলে ফেলতে হয় টিকে থাকার প্রয়োজনেই। না হলে চলমান বহু মানুষের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসহনীয় একক অস্তিত্ব নিয়ে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে নিমজ্জিত হতে হবে কিংবা টুপ্ করে ঝরে পড়তে হবে। কেউ কোনোদিনও তার হদিশ জানবে না খুঁজেও দেখবে না সে-অজানা জীবনকে।

পুরুলিয়ার দর্পণে লেখক এভাবেই সাবলটার্ণ জনগোষ্ঠীগুলির ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন ও বাঁচার দুর্মর প্রয়াসকে কথারূপ দিয়েছেন। লেখক বলেছেন—

> ''আমি সারা বছর ঘুরেই বেড়াই। পাহাড়ে-জঙ্গলে নদীর চরে চরে, শবর-সাঁওতাল-বাউরি-কুড়মিদের গ্রামে, আদিবাসী মেলায়, বাউল-ঝুমুর-খেমটি নাচের আসরে। ঘোরাঘুরির জীবনের কথা বলতে মনে হতে পারে, আমি বুঝি লেখার প্লট খুঁজতে

বেরিয়ে পড়ি। পুরুলিয়া তো আমার পিতৃপুরুষের দেশ। এই ভূখণ্ডের লোকজীবনের বিষয় খুঁজতে জীবনভোর ঘুরে বেড়ানোর প্রয়োজন নেই। আমি ঘুরি বহু মানুষের মধ্যে নিজেকে খুঁজতে, বিকশিত করতে, শিক্ষিত করতে এবং বহু করুণ ও বিস্ময়কর জীবনের অস্তিত্বের অমানবিক লড়াইয়ের সান্নিধ্যে এসে, অহং দমন করে, অন্তর্নিহিত মানবিক সত্তাকে উন্মোচিত করতে।" [১৩]

শবর চরিত (১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৫)

নলিনী বেরার 'শবর চরিত' দেশজ-লোকজ-বৃত্তান্তধর্মী রীতিতে লোধাশবরদের জীবন নিয়ে রচিত এক সু-বৃহৎ উপন্যাস। উড়িষ্যা-সীমান্তবর্তী সুবর্ণরেখা, গোপীবল্লভপুর সহ জঙ্গলমহাল এলাকার ভূগোল প্রকৃতি, ইতিহাস, কিংবদন্তি, বিশ্বাস আচার, উৎসব-প্রথা, প্রচলিত ভাষা, প্রবাদ সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অবস্থার এক বহুবিচিত্র ক্যানভাসে অঙ্কিত এই উপন্যাস। সমালোচক বলেছেন—

''সব জিনিসকে টুকরো করে আনতে-আনতে একসময়ের আত্মবিস্মৃত ও উৎকেন্দ্রিক ছন্ন মানুষ যখন নিজের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ সহ সমস্ত পরিসর ও ক্রমিকতাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত, কী করে ভারতীয় বাস্তবের চিরব্রাত্য পরিসরকে প্রবল যত্নে ও নিষ্ঠায় খনন করেন নলিনী? নিম্নবর্গের ইতিহাস পাঠ কীভাবে সৃজনশীল উদ্যোগে রূপান্তরিত হতে পারে, চারটি পর্বে বিন্যস্ত এই মহা উপন্যাস তারই নিদর্শন। তার মানে, আভিজাত্যগর্বী আধুনিকোত্তরবাদী যতই ইতিহাসের মৃত্যু ঘোষণা করুন, অপ্রাতিষ্ঠানিক আখ্যান-ভাবুকরা ঠিকই পুনরাবিষ্কার করেন প্রান্তিকায়িত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত ইতিহাস। গুপ্ত গিরিগুহায় অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান অস্থিকঙ্কালের রেখায় যা আভাসিত ছিলো—তাদেরই পুনর্গঠন করে নলিনী উপন্যাসের পদবী দিয়েছেন।" [১৪]

শবর চরিত কেবল মাত্র লোধা শবরদের জীবনের ছন্দময় আখ্যান নয়, আদিবাসী চেতনার অন্তঃস্থলে সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত শ্রেণিক্রমিক জীবনযাপনের আততি। আধুনিক সভ্য পৃথিবীর বিপরীতে আদিম অন্ধকারময় জগতে এক ভীত-সন্ত্রস্ত জীবন কাটায় তারা।

'দুটিতে জঙ্গল থেকে বেরুল, একজন ঢ্যাঙা, আর একজন বেঁটে বামন। রাইবু আর গুড়গুড়িয়া' ঘন অন্ধকারে বারোটা শালবল্লা ঘাড়ে নিয়ে ওরা ছুটেছে মহাজনের কাছে বিক্রি করতে। এরা রাতকুটুম, চরে খেতে বেরিয়েছে। মহাজন মনা সাউ রসরস বল্লাগুলো শুকে দেখে তবে কিনল। ওরা কেউ এই শবরদের বিশ্বাস করে না কারণ অনেককাল আগে থেকেই ওরা, 'অপরাধ প্রবণ জাতি'। ব্রিটিশ শাসক বর্গ দ্বারা চিহ্নিত। বিশ্বাস না করার কারণও ঘটে। একই শাল বল্লা এক মহাজনকে বিক্রি করার পর, আবার সেগুলি চুরি করে একই রাতে তারা অন্য মহাজনকে বিক্রিও

করে দেয়, ধরা পড়লে অকপট অস্বীকার ও ভন্ডামির সাহায্য নেওয়া ওদের কাছে জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম। কারণ অভাব, ক্ষুধা। এই ক্ষুধার কারণেই তারা চুরি করে, তাদেরকে দিয়ে চুরি করানো হয়।

এ জঙ্গলের নাম তপোবন, তপোবন জঙ্গলমহাল। খুব ভোরে দঙ্গল বেঁধে লোধা ছেলেমেয়েরা জঙ্গলে ঢুকে যায় ঝাঁটি কুড়োতে পাতা ছিঁড়তে, জাম জামরুল, বন আলু, ফলমূল, শাকপাতা, ছাতু বা পিঁপড়ের ডিম সংগ্রহ করতে। এক বিস্তীর্ণ ছায়াঘন বনাঞ্চল তপোবন জঙ্গলমহাল তারই কিনারে দোরখুলির লোধা বস্তি। হতদরিদ্র লোধারা, কৃষিজীবী সাঁওতাল আর কামার-কুমোর সহ অন্য জাতের কিছু মানুষের বসবাস এ অঞ্চলে।—

> ''মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু কিছু অংশ জুড়ে তপোবন জঙ্গল মহাল। এতে আছে সীতাকুন্ড, যজ্ঞকুন্ড, হনুমান চৌকি, তাড়কা রাক্ষসীর হাড় আর আশ্রম। আর আছে সীতানালা, নাকি চিরদুঃখী সীতার অশ্রুতে গড়া ছোট নদী। তার দুধারে ঘাসবন, ঝামাপাথর। চাগড়া চাগড়া রসকলির তিলকমাটি। আর জলে পুরু ভেলভেটের তুল্য শুশনি শাক, ঝোপঝাড় টকশাক। লোধা জনমানুষ দুহাতে ঝোপ ফেড়ে ঢুকে যায়, যেন মায়ের গর্ভে ঢুকে। তারপর দেহতত্ত্বের গোলকধামে বিচরণ। তারপর দুহাতে ঝোপ ফেড়ে বেরিয়ে আসা।'' [১৫]

জঙ্গলে ঢুকলে খেদিয়ে দেয় গার্ড নরসিঙ। রাইবু-শিশুবালা, সোমবারি, গুড়গুড়িয়া, জটালধা, ভবনলধা, ফুলটুসি—এইসব লোধা লোধানিদের রোজনামচা উপন্যাসের প্রথম পর্ব। এদের বিপরীতে আছে মনা সাউ, দিল্লীশ্বর মাহাতো, আর মুদি দোকানী বঙ্কা মাহাতো। বঙ্কা মাহাতোর গভীর যোগাযোগ লোধাদের সঙ্গে। এদের সকলরই সময় বিশেষে প্রয়োজন হয় লোধাদেরকে। মুখের আস্বাদ ফেরাতে একদিন ভালো করে খাবার লোভে রাইবু গুড়গুড়িয়া যেমন দিল্লীশ্বরের ছাগল চুরি করে তেমনই ভুবনের বউ ফুলটুসিকে গিয়ে আঁচল পাততে হয় বঙ্কা মাহাতোর দোকানে, বিনিময়ে লোধা রমণীকে ভোগ করার সুযোগ পায় বঙ্কা মাহাতো। কারণ ফুলটুসি বা শিশুবালারা জানে 'মাগনা'য় কোনো কিছু পাওয়া যায় না।

রাইবু নিজেকে জঙ্গলের রাজা ভেবে মনে ফুর্তি অনুভব করে। সময় অসময়ে অপরিচিত পাখির 'টি-উল টু-টু টি-উল টু-টু' ডাক শুনে ওর মনে হয়, আজ রাজাটাজা হয়ে যাবে নিশ্চয়, বনের রাজা, জঙ্গলমহলের রাজা। জঙ্গলের দিকে চোখ রেখে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে তাই তাকে মাঝে মাঝে এসব ভেবে নিতেই হয়।—'সে আপনার মনে টুরটুর হেঁটে যাচ্ছে। যাচ্ছে জঙ্গলের দিকেই শতেক লোধা-লোধানী তাকে নমো করছে, বলছে হুই দ্যাক রাজা যাচ্ছে শব্বর রাজা। নমো কর নমো কর'। তার মনের এ ভাব সে চেপে রাখতে পারে না সভ্য মানুষের সামনে প্রকাশ

করে আর হাস্যরসের খোরাক হয়। বড়খাঁকড়ির হাই ইস্কুলের মাস্টার, উপেন কম্পাউণ্ডার হো হো করে হেসে ওঠে। রাইবু বলেই চলে—'লোকে বলে, রাইবুই জঙ্গল মহালের রাজা। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও দেখতে পাই, হাতির পিঠে চলেছি, দু'ধারে লোক-জন নমো কচ্চে'। এ হেন রাইবুর দিনান্তে অন্ন জোটানো দুষ্কর, বৃদ্ধ বাবা, বোন সোমবারি, আর শিশুবালা সহ চারটে পেট চালাতে রাইবুকে অনেক 'ধান্ধা'তেই বেরোতে হয়, সঙ্গী গুড়গুড়িয়া। শিশুবালা আর সোমবারি জঙ্গল ঢুন্ডে নিয়ে আসে, শাক, গুগলি, ছাতু, মিষ্টি আলু, হাটে বিক্রি করে দিয়ে আসে রাইবু। ভুবন লোধা সারা দুপুর দোরখুলির জঙ্গলে ঢুকে শাবল হাতে নিয়ে বন আলুর সন্ধান করে। চারদিকে শাল অসন গাছ। 'এসব গাছের রসে ধুনো হয়, যে ধুনো দ্যাবতার চরণে সেবা লাগে', তাও বেচে ভুবন লোধা, দুচার পয়সা পায়। আসন গাছে তসর পুতলী ভালো গুঁটি বাঁধে। তসরগুটি বাবুরা চড়াদামে কিনেও।' তার বউ ফুলটুসি খোঁজে কাছে পিঠে কোথাও কাড়ানছাতু কুড়কুড়িয়া পরবছাতু পায় কিনা, অথবা ভাতঅলা কুরকুটও (সাদা ডিমঅলা লাল পিঁপড়ে)। এসবই থাকে ঝোপের আড়ালে, 'চিরে ফুঁড়ে খুঁজে দেকতে হয়' সারাদিন ধরে। তবুও ওরা তো জরা শবরের বংশধর ব্রাহ্মণের থেকেও বড়। ভুবন বলে ফুলটুসিকে—

> ''তোকে বলি ফুলটুসি, ভগবান স্বয়ং একবার গাছে বসেছিলেন পা ঝুলায়ে, পদ্মফুলের মত রাঙা পা দু'খান। ত জরাশবর মিরগির (মৃগী) কান ভেবে কাঁড় (তীর) ছেড়ে দিল-অ, ... আর যেই কাঁড়ে ভগবান মরে গেল। কিন্তুক বলে গেল, জরারে তুই বেড়ে পুণ্যিমান, এবার থিক্কে তোর জাত হবে বেরাম্ভনের থিকেও বড়।" [১৬]

ভুবনের মেয়ে নুকু আবার এর ভেতর থেকেই অনেক দূরের চাঁদবিলার ইস্কুলে যায় লেখাপড়া শিখতে। সরকার নাকি এখন লোধাদের উন্নয়নের জন্য অনেক কথা ভাবছে। ভুবনের মেয়ে লেখাপড়া শিখলেও সে ভাবে—'দুদ্দুর, লোধা জাইতে (জাতিতে) উ-সব ফের করে কে?' চুরির অপরাধে পুলিশ প্রায়ই ধরে নিয়ে যায় লোধাদের। ওদের ভাবনা খাদ্যের। তাই গুড়গুড়িয়া ভাবে—'আচ্ছা, হাজতে চালান হয়ে গেলে রোজ রোজ কিরকম খেতে-টেতে দিবে, ভাত ত থাকবেই'। এভাবে অনাহারে বাঁচার চেয়ে সেটা বরং ভালো। জঙ্গল শুধু লোধাদের 'মা-বাবা' নয় আরও অনেকের অন্ন জোগান দেয় দোরখুলির জঙ্গল,—

> ''হই-হই, লে' গেল লেগেল-অ বলতে বলতে এক দঙ্গল মেয়ে হুড়মুড় করে জঙ্গলে ঢুকে শুকনো ঝাঁটি, পাতাপতর ছিঁড়ে নিচ্ছে,—কারো হাতে দা-কাটারি, কুঠার হাতে কেউ কেউ। কচিকাঁচা শালগাছ ঠুঙ করে কেটে ফেলে, ফালা ফালা চিরে শুকোয় রোদ্দুরে, তারপর আঁটি বেঁধে যায় বড়খাঁকড়ির হাটে।...এরা লোধা নয়, মাহাতো-সাঁওতাল-ভূমিজ, হরেক জাতের ঝি-বউরা, জঙ্গল এদেরও দানাপানি দেয়।" [১৭]

তবে এই মাহাতো-সাঁওতাল-ভূমিজদের কাছেও লোধারা ব্রাত্য, অসম্মান আর ঘৃণার পাত্র। এতটাই প্রান্তে তাদের অবস্থান। জরিলালের মা চোখ রাঙিয়ে সোমবারিকে জিজ্ঞাসা করে সে জঙ্গলে কেন এসেছে, চুরিচামারি করার কোনো ধান্ধা আছে কিনা। সোমবারির চোখ অজস্র রাগে রাঙা হয়ে ওঠে ঠিকই কিন্তু এ তাদের নিত্য দিনের ঘটনা। সকলেই লোধাদের সন্দেহ করে। দুনিয়ার যেখানেই 'চুরিচামারি' হোক না কেন দারোগা চোর খুঁজতে যান লোধাপাড়াতেই। মদ্যপ দারোগা আর তার সাকরেদ ড্রাইভার কান্তি বা সিপাই মদনসহ লোধাপাড়াতে চোর খুঁজতে আসার আলাদা কারণও আছে। মূলত লোধারা ভীতু, সব কিছুতেই তাদের একটা ভয় কাজ করে। দারোগা যখন লোধা পাড়ার মোড়ে রাতে হানা দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিয়ে থামিয়ে রাখে সে আলো যতক্ষণ জ্বলে ততক্ষণ লোধা পাড়াতে কোনো পুরুষ থাকে না। বস্তিতে মা, বৌ, বোন, মেয়ে সকলকে ফেলে জঙ্গলে লুকিয়ে যায়। এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে দারোগা ও তার দল। লোধা মেয়েদের যথেচ্ছ ভোগ করা যায় এসময়, ভয়ে তারা বাধ্য হয় নিজেদের বিকিয়ে দিতে। পাড়ায় এসে রাইবুর বৌ শিশুবালার ওপর চড়াও হয় দারোগা। নিম্নবর্ণের নারীদেহ দখলের উচ্চবর্গীয় আস্ফালন শোনা যায়—

> ''...ইডিয়ট, বুঝিস না আমার ঔরসে তোর পেটে লোধাবাচ্চা হবে না, হবে বামুন বাচ্চা, —এসব ভেবে ভেবে তোর সুখ হচ্ছে না, সুখ? বামুন? বিশ্বাস কল্লি না, তবে এই দ্যাখ, খাঁটি বরিশালের কশ্যপ রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।''

বড় দারোগা জামার ভিতর থেকে ধপধপে সাদা পৈতেটা টেনে এনে শিশুবালার চোখের সামনে তুলে ধরলেন।

> ''শিশুবালা দু'চোখ বুজে ফেলল, যেন দেখতে পেল, ভগবান সয়ং গাছে বসে আচেন পা ঝুলায়ে, পদ্দোফুলের মত রাঙা পা দুখান, ত রাইবু লোধা কাঁড়বাঁশ লিয়ে ইদিক-সিদিক ঘুরচে, ঘুত্তে ঘুত্তে গাছের উপর মিরগির কনান দেখে কাঁড় ছেড়ে দিল্ল অ, সেই কাড়ে ভগবান মরে যাচ্চেন, রাইবুরে তু বেড়ে পুন্নবান, ইবার থিকে তোর জাত হবে বেরাম্ভণের চেয়েও বড়।''

জঙ্গল মহলের রাজা দোরখুলির শবর পল্লির মাতব্বর রাইবু লোধা তখন কোথায়? ঠিক সেই সময়েই দেখা যায় অন্য একটা ছবি—

> ''লোধাপাড়ার বেপোট এলাকায় ঢুকে থানার বড়বাবু যখন অকুতোভয়, তল্লাসি চালাচ্ছেন নির্ভয়ে, মনের সুখে, তখন দোরখুলির জঙ্গলে লোধাপাড়ারই পুরুষলোধারা লাটাপাটার আড়ালে লুকিয়ে বসে থেকে বেদম ভয়ে কাঁপছে ঠিরঠির করে।'' [১৮]

যতক্ষণ তল্লাশি চলবে ততক্ষণ লোধারা আর 'ঘরমুখো' হবে না। এই রকমই চলে আসছে সেই শুরুর সময় থেকে। তাই 'গিদ্‌ধাড়' 'হাটুয়া' লোকেদের বিশ্বাস করে না ওরা। তাদের ধৈর্য অসীম সব অত্যাচার যেন মান্ধাতার আমল থেকে সহ্য করে আসছে। এ কাহিনি চলতেই থাকে তাই জঙ্গলমহালের রাজা রাইবুর কথায় তার বাবা রাজার বাপ মহারাজ গেঁড়া শবর বলেছে—

> 'কদ্দিন কী রে, চাঁদ-সূয যদ্দিন। সেই বলে না—ধান খাহল শুঁড়ির ষাঁড়ে, পড়ল বামাল তাঁতির ঘাড়ে। চুরি হৈল যথা তথা, চোর ঢুঁড়তে লোদ্ধাপাড়া। গেল রাতে হইছে, হয়ত আবার হবে আসচে রাতে। আসচে রাত কোন মতে পার হয় যদি ত পরশু। পরশু না হলে তরশু'

তবে এসবের জন্য লোধারা নিজেদের পাপকেই দায়ী করে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষ ভগবানকে হত্যা করেছিল যে। তাদের জাতির উপর 'অপরাধ প্রবণ'-র তকমা যেমন যাবে না তেমনই তাদের এই দৃঢ়মূল বিশ্বাসও কোনোদিন ভাঙবে না। তারা ভগবানের হত্যাকারী, তারা পাপী।

সময়ের হিসাবও লোধাদের জঙ্গলকে অবলম্বন করে। রাত-দিন-মাস-ঋতু-পূর্ণিমা-অমাবস্যার পরিবর্তন তারা বোঝে ঋতুতে ঋতুতে জঙ্গলের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে, খাদ্য সংগ্রহের মধ্য দিয়ে। পুঁজি-পুথি তাদের দরকার নেই। বাঁধনাপরব, বড়ামপূজো 'যুগিনীবাটিয়া' গমাপুন্নিমা সব উৎসবেই লোধা জীবনে সমান। ব্রাহ্মণদের, কুম্ভকারদের, সাঁওতাল, মাহাতোদের উৎসবের আয়োজনকে তারা অনেক দূর থেকে উপভোগ করে। ওরা থাকে ওদের লোকবিশ্বাস নিয়ে—'ওই গম্‌হা পুনোইয়ের দিনই বড়ামথানে পূজা লাগা, রাইবু। ঐ দিনইত বনদুর্গা গম্‌হাসুরকে নিধন করে লোধাশবরদের, আমাদের পূর্বপুরুষদের, রক্ষা করেছিল'। এ সব কাহিনিই সঠিক জানে গজনালোধা। রাইবু মনে মনে লালায়িত হয়ে ওঠে 'তসর ঠয়া'-র জন্য। এই শুভদিনে তারা নিজেদের লিজ নেওয়া জঙ্গলে, 'আড়া'তে তসরচাষের সূচনা করবে। এর চেয়ে বড় উৎসব লোধাদের কাছে আর কিছু হয় না। শাল-আসনের 'লিজ' দেওয়া বনভূমিতে 'তসর ঠয়া'র চাষ হয়। এতদিন অন্যের লিজ নেওয়া 'আড়ায়' তারা চাষ করে এসেছে এবার নিজেরা 'লিজ নিলে হয় না।'। কিন্তু তা তো অনেক টাকার ব্যাপার। কোথা থেকে পাবে। কে 'উধার' দেবে তাদের। লোধারা চাষ করে না, তাদের অন্ন নেই, ভূমিও নেই। জঙ্গলের মধ্যে সুখজড়িতে দু-ঘর সাঁওতাল, দোরখুলিতে একঘর তাঁতি আর মাহাতো, ভূমিজদের জমিজমা আছে, ওরা চাষ করে। আর ফসল ভরা মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকে লোধারা, সুযোগ বুঝে চুরিও করে। না করলেও চাষীরা ওদের সন্দেহ করে। রাইবু লুকিয়ে লুকিয়ে কতদিন হাত বুলিয়ে দেখেছে ধান গাছগুলির লহ লহ পাতায়।—

> 'এসব ধানক্ষেত বাবু-ভাইদেরই। কোথায় তাদের গাঁ আর কোথায় তাদের এইসব ধানক্ষেত। উঠ্‌বন্দী খাস না তারা রায়তি কে জানে, কে জানে। রাইবু জানে না। সে শুধু জানে,

তাদের জমি নেই। ছিলও না কোন কালে। বাপ কথায় কথায় বলত, এখনও বলে, নাকি পুরুল্যার পারগোড়া লড়াই-ডুংরি লটপদা গাড়াসাগমা, আরো কী কী গ্রামের খেড়িয়া শবররা চাষবাস করে কোঠা বাড়িও আছে তাদের। খেতি না থাকলে অন্যের খেতিতে কাজ করে।"

লোধারা চাষ করে না কারণ তাদের পূর্বপুরুষের উপর শিবঠাকুরের অভিশাপ আছে। তাদের লোককাহিনিতে চাষবাসের সঙ্গে শিবঠাকুরের গভীর সম্পর্ক আছে, পৌরাণিক কাহিনিকে এভাবেই তারা মুখে মুখে ধারণ করে, বহন করে নিয়ে যায়।

"রাইবুর বাপ গেড়াশবর বলে, বড়সোলের গজনালোধার মুখ থিকে শুনা, লদ্ধাদের চাষবাস শিখাতে পেথমে গরু হাল দিল শিবঠাকুর। দিয়ে বলল, চাষবাস কর। জঙ্গল কেটে চাষের জমি তৈয়ারী কর। ত জঙ্গল কাটতে কাটতে শব্বরে খিদা-তেষ্টা পায়। কী খায়, কী খায়—ন হালের বলদটাকেই কেটে খেয়ে ফেলল। কিসে করে খেল—ন, হাতির কানের তুল্য সেগুন পাল্‌হায়। সেই থিকে জানবি সেগুনের জগ ভাঙলেও রক্তের মত রস গড়ায়। যাকে দিয়ে চাষবাস করবি, তাকেই কিনা কেটে খেয়ে ফেললি! হায়রে বোকার জাত। রাগে কাঁই শিবঠাকুর তেখন অভিশাপ দিল, বনে-জঙ্গলেই ঘুরে ঘুরে মরবি তোরা। তোদের কপালে চাষবাস নাই। সেই বলে না, 'কপালে নাইক ঘি, ঠকঠকালে হবেক কি?" [১৯]

দ্বিতীয় পর্বে সুখজুড়ির গোব্‌রা সাঁওতাল সামাইয়ের মেয়ে ফুড়গুনিকে কৃষি কাজ আর কৃষিকে কেন্দ্র করে যে-পরব, সে-সম্পর্কে এরকমই একটি গল্প শুনিয়েছে। 'সহরায়' উৎসবের বৃত্তান্ত। গরু আর মানুষের গল্প।—

"শুন্ ন— ঠাকুরজীউ মহাদেব ত গরুকে পাঠাল, যাহ্ গরু, মর্ত্যে যেঞে মানুষকে চাষাবাদে সাহায্য কর। সেই থিকে গরু-ত ঘাড় গুঁজে লাঙল টানে, মহী টানে, গাড়িতে জুতে মানুষ তাকে যথা ইচ্ছা তথায় নিঞে যায়। ..."

"শিবঠাকুর গরুকে বলল, মর্ত্যে যা, যেঞে পরচার কর, মানুষকে বল, খাবি এক বেলা, শিব জপবি তিন বেলা। বলতে যেঞে গরু ত গুলায় ফেলল। বলল, খা তিন বেলা শিব বল একবেলা। ... ঠাকুরজীউ মহাদেব ত রেগে কাঁই এখন মানুষ কে তিন-বেলা খাবার জুগাবে কে? যা গরু, মর্ত্যে যেঞে মানুষকে চাষাবাদে সাহায্য কর। সেই থিকে—

হেঁ সেই থিকে গরুত খেট্টে মরছে। লাঙল টানতে গাড়ি টানতেই তার কাঁধে কড়া পড়ল, খেতে না পেঞে শরীল হাড়পু হৈল, পইনার বাড়ি খেঞে পাছায় দাগা ধরল।

মহাদেব হে, মানুষ বড় কু-জাত, খাটায়, খেতে দেয় নাই। গরু বলল। ত মহাদেব বলল আচ্ছা দেখা যাবে কার্তিক মাসের আমাবইসায়, চুপচাপ যাব।" [২০]

ধানকাটার সময় জঙ্গলে মোচ্ছব লেগে যায়। তবে লোধারা এসবের নীরব দর্শক। ধান পাকার পরই পাহারাদারির পাকা ব্যবস্থা হয়। এই সময় লোধাপুরুষ-নারী এমনকি 'ন্যাঙটাভুটুঙ' 'ছা-ছানারা'ও যদি পাশ দিয়ে যায় তো সকলেই আড় চোখে দেখে। গরু ছাগলে ধান ছিঁড়ে খেলেও বলবে—'এই লোধাছানারাই চুরি কেরেছে ধর ব্যাটাকে'। 'চোর চোর খালি চোর অপবাদ। খালি খালি চোর অপবাদ'। মাঠের রাখাল বাগালরাও তাদের চোর ভাবে। পেটের দায়ে জঙ্গলে শুধু লোধাদেরই আসতে হয় না, অন্যজাতের অভাবী মানুষদেরও আসতে হয়। কুমোর পাড়ার ব্রহ্মাকুমার ও তার স্ত্রী লোধাদের আপনজন, সহমর্মী। কারণ ব্রহ্মার কাছে সবাই সমান। 'জাতে কী হবে? আসল কথা ত পেট'। লেখক কুমোরদের জীবনযাত্রা, জীবিকা পদ্ধতি বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, এরাও তো মূলত নিম্নবর্গেরই মানুষ। এরা হাঁড়ি কুঁদা গড়ে। মাটির হাঁড়ি কলসি গড়বার জন্য নদীর ধার থেকে মাটি সংগ্রহ করে আনে 'সুসার' মাটি। আর হাঁড়ি কুঁড়ি পোড়াবার জন্য কাঠ তাদের দরকার হয়। তাই জঙ্গলে তাদের আসতেই হয়। জঙ্গলে সকলেরই আছে গার্ড নরসিঙার ভয়। যে-কোনো মুহূর্তে ধরে চালান করে দিতে পারে। কারণ ওরা পারমিট ছাড়াই জঙ্গলে ঢোকে। যখন তখন নরসিংহ মাহাতো লোধা ও কুমোরদের ধরে নিয়ে যেতে পারে।

তসরঠয়া চাষের জন্য জঙ্গল লিজ নেওয়ার অর্থ সংগ্রহ করতে রাইবু সকলের কাছেই হাত পাতে। মহাজন, সাধুবাবা সকলের কাছে। মহাজনের ঘরে যেতে ভয়ই পায় কারণ—'গেল সনেই তসরঠয়া-র চাষ-আবাদ বাবদ দাদন নেওয়া আছে। এখন তার কী হবে? চাষ উঠলেই ত দাদনবাদ কাহন কাহন তসরগুটি 'আড়ায়' ঢুকে প্রায় কেড়েই নিয়ে যাবে মহাজনরা'। তাছাড়া মহাজনদের হারিয়ে লোধারা তসর করতে জঙ্গলমহাল লিজ নেবে তাদের এ ঔদ্ধত্যও সহ্য করা যায় না। 'এই ত কলির শুরু সবে। দিনে দিনে কত-অ দেখবে'। তসরগুটি চাষের পদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আছে, তসর বীজ সংগ্রহ থেকে শুরু করে।

> ''তসর-ঠয়া বা তসর গুটি। নিগমা মন্দির এক, যার আগমনও নেই নিগমনও নেই। ভিতরে ঘুমিয়ে আছে তসর পুতলী। তসর গুটির মাথায় অবিকল লোহার আংটা, কালো রঙের ... কালে তসর-পুতলী ঘর কেটে তসর পুতুলী বা প্রজাপতি হয়ে বেরিয়ে আসবে ডানা মেলে উড়বে-ঘুরবে তসর-ঠয়ার আশ-পাশে, নিজ নিকেতনে। ... সমগ্র লোধাপাড়া তখন হয়ে যাবে এক অলৌকিক সূতিকাগার। ভাবো, কতগুলো কেলে-কুলো মানুষ, নেংটিমাত্র পরনে, ভাত নেই পেটে, একঘটি জল খেয়েই যাদের দিন কাবার। অলম্ভুসের মত তারা ঘর-বাহির করছে, আর তাদের মাথার উপর দেহের উপর হাতের উপর পায়ের উপর উড়ে-ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা রঙের হাজারটা প্রজাপতি ... ডিমও ত পাড়ে সাদা সাদা রাই সর্ষের মত। তবে সামান্য চাপা পুরোপুরি গোল নয়! ডিম যে-কালে পড়ে, সে-সময় আমসারের মত ঝুলন্ত 'তসর ঠয়া'র নিচে পেতে দিতে হয় খেজুর পাতার নতুন চাটাই আর নয়ত নতুন গামছা।'' [২১]

এর কিছু দিন বাদে সুতোয় বাঁধা ঝুলন্ত গুটিগুলোর তলায় পেতে রাখা নতুন খেজুর পাতার চাটাই ভরে গেল রাই সর্ষের দানার তুল্য ছোট ছোট দানায়। গোলাকার নয় চ্যাপ্টা মতো। তসর প্রজাপতির ডিম। সোমবারি, শিশুবালা, ফুলটুসিদের তখন অনেক কাজ। ঘরে বসে বসে হলুদ মাখায় তসর প্রজাপতির মতো ডিম গুলো আগলে রাখে যেন লোধাদেরই ছানাপোনা। তার পর 'চারা' নিয়ে 'আড়ায়' ঢোকে রাইবু, গুরভা, গুড়গুড়িয়া, শরাবনরা, আরা তৈরি করে রাখতে হয় পূর্বে, তাও বেশ পরিশ্রমসাধ্য। তপোবন জঙ্গলমহলের কয়েকশ একর বনভূমি বেড় দিয়ে লিজ নিয়েছে লোধারা। সে-আড়ার আড়তদার রাইবুলোধা। এখন আর গার্ড নরসিঙাকে তারা ততটা ভয় করে না। স্বাধীনভাবে কাজের আনন্দ, তাদের মুক্তির আনন্দ। এখন রাইবুর নিজেকে সত্যিই 'শব্বর রাজা' মনে হয়। কাজের ভুল ভ্রান্তির জন্য কাউকে জবাবদিহি করতে হবে না। নিজেদের দোষ নিজেরাই মাফ করবে। চড়-চাপড় খেতে হবে না কারোর কাছে। ধানের চারা রোপণের মতোই যত্ন নিয়ে তার আড়ায় তসর প্রজাপতির ডিম নিয়ে যায়। স্বপ্ন আশা নিয়ে। দাদন নেওয়া টাকা কবেই ফুরিয়েছে। এখন ভুখা-শুখা পেটে কাজটা তুলতে পারলেই ডিম নিয়ে যায়। নিজেদের কাজের জন্য এই প্রথম তারা গর্ব অনুভব করে। তাদের উপরতলার লোকেরা যতই বলুক লোধারা বোকার জাত বা চোরের জাত শুধু এই একটিমাত্র কাজেই তাদের লোধাদের উপর নির্ভর করতে হয়। লোধারা জানে এ কাজে তারা কতটা প্রয়োজনীয়।—'কে বলে লোধারা চাষ জানে না? লোধাও বলে,—চাষ তারা ছাড়া আর কেউ জানে না। জানলেও 'ভাল্লমত' জানে না। তাই তো ঘুরে ফিরে মহাজনরা তাদের কাছেই আসে'। তবুও জঙ্গলে ঘটে যাওয়া সমস্ত অপকর্মের দায় লোধাদের উপরই বর্তায়। বিনা অপরাধেও তাদের শাস্তি পেতে হয়, খুন হতে হয়। কোথাও কোনো অঘটন ঘটলে অন্য সকলে লোধাদের জন্য অস্ত্র সানাতে শুরু করে। হড়-সাঁওতাল ও লোধারা জঙ্গলেরই জীব, পাশাপাশি থাকে। তবে চোরচোট্টা লোধাদের তারা আপনজন ভাবে না বিশ্বাসও করে না। সাঁওতালরা পরিশ্রমী, জঙ্গলের প্রান্ত জমিতে ফসল উৎপন্ন করে। তাদের অবস্থা লোধাদের থেকে শতগুণে ভালো। নদীর ধারের জমি হয়তো তারা পায়নি কিন্তু তাদের আছে জঙ্গল। 'শাল, পিয়াশাল, ধ, আসন, গুঁদলি, জনার, আশধান আর কুরথির চাষ করে তারা মেয়ে পুরুষ সকলে মিলে। 'দিক' মহাজন আবার সাপ ইঁদুর ব্যাঙ খাওয়া লোধাদেরও বিশ্বাস করে না।

কুদরা সাঁওতালের মেয়ে মরণী জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে যায়। একা একা জঙ্গলের ধারে ধান কাটতে গিয়ে ধর্ষিতা হয়ে গেল মরণী। কুদরা কপাল চাপড়ে দৌড়াল মাতব্বরদের কাছে। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেল—'শালগাছের ডাঁটিতে 'গিরা' বেঁধে, তাতে সিঁদুরের প্রলেপ দিয়ে মৃত্যুদন্ডের পরোয়ানা 'সারজাম' পাঠানো শুরু করে দিল পরগণা থেকে পরগণায়'। সন্দেহ সমস্ত অপকর্মের মূল লোধাদের।—ভুবন লোধাকে ওরা কেটে দুটুকরো করে খুন করে। রাইবু সহ বাকিরা জঙ্গলে

উধাও হয়। গুড়গুড়িয়াকে বড়দারোগা ধরে নিয়ে যায় থানায়। সোমবারি আশ্রয় নেয় তপোবনের সাধুবাবার আশ্রমে। সাধুবাবা হল 'ক্যাঁকশাল' অর্থাৎ রঙ বদলানো গিরগিটি সদৃশ। লোধারা তাকে চিনতে পারে না। সময়ে অসময়ে লোধাদের খাবারের লোভ দেখিয়ে সে বশে রাখে। সুযোগ বুঝে, বিপদের সময় আশ্রয়প্রার্থী ভীতু লোধা মেয়ে সোমবারিকে নিয়ে পালিয়ে যায়। লোধারা তো আর সম্পূর্ণ মানুষ নয়। তাই তাদের ঘৃণা করা, ঠকানো, লোধা মেয়েদের ভোগ করার যথেচ্ছ অধিকার জন্মায় এই সমস্ত শোষকদের। লোধারা সহজে কোনো সভ্য মানুষকে বিশ্বাসও করে না। সকলকেই তাই ভয় করে, সভ্য পোশাকের মানুষের সামনে ওরা আসতে চায় না সহজে। লোধাপাড়ায় সভ্য সমাজের প্রতিনিধি কোনো মানুষ গিয়ে পৌঁছালে লোধা পুরুষ জঙ্গলে ছোটে আর লোধা মেয়েরা বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে ঘরে আগড় তুলে দেয়, যতক্ষণ না সে ব্যক্তি লোধাপাড়া ছাড়ে। বড়খাঁকড়ির হাই স্কুলের মাস্টার আদিত্যকে উপেন কম্পাউন্ডার বলে—'দে আর ভেরি সিম্পল এন্ড ইন্টারেস্টিং। তুমি আদিত্য, এদের এসব নিয়েও ত লিখতে পারো?' কিন্তু লোধাবস্তিতে ঢোকা তো অত সহজ নয়, ঢুকলেও নিরাশ হয়েই ফিরে আসতে হয় আদিত্যকে। তবে আদিত্য আশা ছাড়ে না। একদিন না একদিন তো ওদের কথা জানতেই হবে সভ্য সমাজকে, সেদিন খুব সামনে। সেদিন শুধু শবর নয়, 'শবর চরিত'কেই স্বীকার করে নিতে হবে। শুধু সহানুভূতি নয় সমমর্যাদার সঙ্গে। তবেই তো আদিত্য অর্থাৎ লেখকের কলম সার্থকতা পাবে। সে-দায়িত্ব তাই লেখককে গ্রহণ করতেই হয়।—

> ''ছুটির দিন সকাল, বিকাল, আদিত্য ঝোলা কাঁধে ইস্কুলের আশেপাশের গ্রামগুলোয়, ভূমিজ পাড়ায় বাউরী পাড়ায়, কারোর ঘরের উঠোনে পাতা চাটাইয়ের দড়ি-খাটিয়ায় বসে 'নোট' নেয়।... আদিত্য থিসিস্ লিখছে ... যা লিখলে ডক্টরেট পাওয়া যায়।" [২২]

আদিত্যও একদিন হয়তো এভাবেই তার সাহিত্যে লোধাজীবন আর জঙ্গলমহলের ভূপ্রকৃতি, ইতিহাস, লোককথাকে জীবন্ত করে তুলবে। 'মেদিনীপুর জেলার ঝাড়গ্রাম মহকুমার নয়াগ্রাম ও গোপীবল্লভপুর থানার কিছু অংশ জুড়ে তপোবন জঙ্গল মহাল। এতে আছে সীতাকুন্ড, যজ্ঞকুন্ড। হনুমান চৌকি, তাড়কা রাক্ষসীর হাড় আর আশ্রম, আর আছে সীতানালা, নাকি চিরদুঃখী সীতার অশ্রুতে গড়া ছোট নদী'।

শবর চরিতে লেখক শুধু শবরদের নয়, কুম্ভকার, সাঁওতাল, মাহাতো, ভুঁইয়া, ভূমিজদের উৎসব অনুষ্ঠানকেও তুলে এনেছেন গভীর জীবন-সম্পৃক্ততায়। 'বাঁদনা' বা 'সহরায়' মূলত হড়-সাঁওতালদের উৎসব। কিন্তু এতে অংশ নেয় সকলেই : সাঁওতাল, কুমোর, ভূমিজ, মাহাতো, সকলেই। লোধাদের মনও আনন্দে মেতে ওঠে যদিও আয়োজন বা অংশগ্রহণের ক্ষমতা ওদের নেই। গরু-মোষগুলো পাঁচদিন আগে থেকে ছুটি পায়, চাষীদের চাষের কাজ বন্ধ। কুমোরদের

মাটির কাজও বন্ধ। তিনদিন ধরে এখন চলবে গরু-জাগরণ, গোহাল পূজা-গইরাপূজা, বুঢ়ীবাঁধনা, গরু-খুঁটা, গরুচুমানো। রাতে কান পাতলেই শোনা যায় 'ট্যাঙয়ানে'র দলের গান। তারা 'গরু জাগাতে' বেরোয়। গোহাল ভরতি গরুগুলোর সামনে কখনো হাত নেড়ে, কখন বা গামছা নেড়ে গরু জাগাতে শুরু করে—

''জাগে মা লক্ষ্মীনি জাগো মা ভগবতী
জাগে ত আমাবইসা রাতি।'' [২৩]

এই পরব কে কেন্দ্র করে সামাই সোরেনের মতো অভাবি মানুষেরা মাগনে বেরোয়। নকল বাঁদরের নাচ দেখিয়ে, গান গেয়ে 'কুম্হারপাড়ায়', 'কাম্হারপাড়ায়', মাহাতো পাড়ায়, ভূমিজ পাড়ায় তারা খাদ্য মাঙতে বেরোয়। লোধাপাড়ায় কেউ মাঙতে যায় না।—'মেঙে খাবার অবস্থা যাদের, তারা আবার কেউ মাগনে এলে হাতে তুলে কী দেবে? তার উপর লোধারা তাদের ঘরের 'সিধা' হাতে তুলে দিলেও সাঁওতালরা সে-সিধা হাতে করে নেবে কি?' ওরা লোধাদের আলাদা করে চিনতেও পারে না, সকলকেই একইরকম দেখে, বাচ্চা, মেয়ে পুরুষ সকলেই এক, লোধা। আলাদা আলাদা ব্যক্তি নয়। 'সহরায়' বা বাদনা যে-কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করেই রচিত হয় গান। গানেই ওরা সব কথা বলতে পারে সাঁওতাল বা কুমোররা গায় এ গান। 'গোঠটাঁড়ে' হাউসের সময় 'ঠেঙুয়াল' লোক গান গায়।

''সরু পরব ত আসে ভালা ঘুরি-ন-ঘুরি যে বাবুহো
মানুষ ম-রলে নাহি আওয়ে,
বনকেরি কাঠপাত-অ গায়েকেরি আগুন-অ
খাসি খসি প-ড়ত অঙ্গার'' [২৪]

এইসব উৎসব লোধারা দূর থেকেই দেখে। গরুখুটারগান, কুমোরদের খেলা, বা সাঁওতালদের নাচ।

ধুতি পাজামা-পরা হাটুয়া বাবুভাইয়া বসন্ত কামিল্ল্যা লোধাপাড়ায় আসে কামিন খুঁজতে, নামাল খাটতে লোধা বউড়ী-ঝিউড়ীদের কামিন এর কাজে লাগাতে। কিন্তু রাইবু জানায় লোধাদের জাতে ওসব নেই। ওরা জন্ম যাযাবর, এখন বসতি বেঁধেছে কিন্তু বিশ্বাস তারা সভ্য পোশাকের মানুষদের করে না। কামিনের লোভ দেখিয়ে লোধা বউড়ী ঝিউড়ীদের নিয়ে যেতে চায়। কামিল্ল্যা-র নজর তাদের শরীর-স্বাস্থ্যের উপর। চোর বদনাম থাকলেও লোধারা লোধারমণীর সম্মান নষ্ট হতে দেয় না। অন্য জাতিতে বিয়েও নিষেধ লোধাদের। তাই লোধা মেয়ে সাবিত্রী কুমোর ছেলে সন্তোষের প্রেমে পড়লে দুই জাতের মধ্যে লড়াই অবশ্যম্ভাবী হয়ে যায়। খেতে না পেলেও

লোধারা অন্যজাতে মেয়ে দেবে না, আর কুমোররা তো লোধাদের ঘৃণাই করে। তবে সাবিত্রীর দাদা গুরভা কিছু ব্যতিক্রমী চিন্তাও করতে পারে—

> ''গুরভা মনে মনে বলল, জঙ্গল জঙ্গল, জঙ্গলের ভিতর আবার সমাজ কী জঙলী পশুদের লেখেনে আমাদের জীবন, শিকার মিললে আহার, নচেৎ উপাস (উপবাস)। এই যে সাবিত্তিরি পেটের জ্বালায় অন্য জাইতের ছ্যাইলাকে ধরল, ধরে কেটে পড়ল, তুমি তার কী কচুটা করলে।'' [২৫]

তবু রাইবু বলে—'সমাজটাকে ত আর উড়াঁই দিতে পারি নাই, বল?'' আর কুমোরপাড়ার সভায় ব্রহ্মাকুমার দেখায় তার পুরাণ শাস্ত্রের জ্ঞান। 'কলি যুগে এরকম অসবর্ণ বিবাহ আকছার ঘটবে। ... পরাশর বলিলেন—কলিকালে ধম্মানুরূপ বিবাহ থাকিবে না। সমস্ত বর্ণই শূদ্রপ্রায় হইয়া আসিবে ... তারা বুঝল যুগটা কলিযুগ, ঘোর কলি'। কলিকালে এরকম উল্টাপাল্টা কত কিছুই ত হয়। কেউ বলে—'কলিযুগে ধর্মাধর্ম বলে কিছু থাকবে না। নিচকুলে জন্ম নিয়েও উচ্চজাতের মেয়েকে বাহুবলে বিবাহ করবে'। আবার কেউ তাকে এর বিপরীত কথাটাও স্মরণ করিয়ে দেয় 'উচ্চকুলে জন্ম নিয়ে নিচু জাতের মেয়েকে বাহুবলে ভোগ করবে'। আবার কেউ সব যুক্তিকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে বলে ওঠে অসবর্ণ বিবাহ বা প্রেম তো সব যুগেই ছিল সত্য, ত্রেতা, 'দ্বারপর' সব যুগে। এমন কি লোধাদের মধ্যেও ছিল। উঠে আসে লোধাদের প্রচলিত লোককাহিনি নিয়ে যাত্রাপালার কথা। 'লোলিতা পালা', যাত্রাতে আছে বিদ্যা আর লোলিতার প্রেমের কথা। শুরু হয় বসুশবর, বিদ্যাব্রাহ্মণ আর শবরকন্যা ললিতার কাহিনি।

> 'এক গভীর জঙ্গল, তপোবন জঙ্গলমহলের থেকেও ঢের ঢের বড় এক বনভূমিতে থাকতো বসুশবর। ভাল নাম বসুশ্রবা। সঙ্গে থাকত তার যৌবনবতী কন্যা ললিতা ... বসুশ্রবার পালিত কন্যা ললিতা। বেরাম্ভনে বেরাম্ভনে মিল হঁয়েছিল ... তবে কেনে বলে লোধা শবররা বেরাম্ভনের থেকেও বড় জাত। তারা বামনাদের গড় করে না। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নই বিদ্যাকে পাঠিয়েছিল বসুশ্রবার আরাধ্য কালিয়া দ্যবতাকে চুরি করে আনতে ... টিকিধারী ব্রাহ্মণ ছিল খুব রাগী, আর উগ্রচণ্ড। কথায় কথায় ললিতাকে ছেড়ে যাবার ভয় দেখাত—দে, দে ললিতা মোরো ছতা, বাড়ি দে। মু চলি যিমু। ছাতা আর লাঠি লুকিয়ে রেখে ললিতা বিদ্যার পায়ে ধরে মিনতি করত। কত-অ রোদন করত! প্রাণো নাথো গো—... লোধা শবরদের মেয়ে জামাই ঐ ললিতা-বিদ্যার ছেলের ছেলে তস্য ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের ছেলের আর কত বলব, তার ছেলের ছেলেরাই এখনো পুরীর রথ টানে। তাদের হাতের ছোঁয়া না পেলে রথ চলে না কম বড় কথা?'' [২৬]

এ কাহিনি তাদের যাত্রাপালা থেকে সংগ্রহ করা। এ প্রসঙ্গে লেখক তার বাস্তব জীবন সঞ্জাত এক কাহিনি স্মরণ করেছেন।—

''চামটু লোধার বোন পিঁদাড়ি... কেউ কেউ বলত চামটু লোধার নিজের বোন সে নয়, পালিতা। আমাদের দেশে ঘরে উড়িয়াতে একটা যাত্রাপালা ছিল ও এখনও আছে 'লোলিতা' বা 'নোলিতা পালা'। সেই পালার সঙ্গে পিঁদাড়ির নিজের জীবনপালা যে কী করে মিশে গিয়েছিল হুবহু! ... নারান দাশ ঠাকুর ছিলেন চালচুলোহীন এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ, অজ্ঞাতকুলশীল, গ্রামের মাতব্বররাই দয়া করে তাঁকে হরিমন্দিরের সেবাইতের ভার দিয়েছিল .. হরিমন্দিরের চাতালের গা দিয়েই গ্রামে আসা যাওয়ার কুল্‌হি রাস্তা। লোধারা রাতভিত সেই পথে-বালিতে মস্‌ মস্‌ আওয়াজ তুলে যেত আসত। শুধু কি পুরুষ লোধারা, লোধাদের বউড়ী ঝিউড়ীরাও। কদিন ধরেই আঁচ করছিল মাতব্বররা সেদিন হাতে নাতেই ধরে ফেলল ... ব্রাহ্মণের সঙ্গে লধানীর প্রেম ... পুরোহিতের পদ থেকে রাতারাতি বরখাস্ত হয়ে গেলেন নারান দাশ। অপমানিত পতিত নারান দাশ জঙ্গলে লধাবস্তিতে উঠে গেলেন। যজমানী ছেড়ে লোধাবৃত্তি ধরলেন ... হাটবার হাটবার পিঁদাড়ির মাথায় চাপিয়ে দেন কাঠের বোঝা। হাটে তিনি নিজে যান না। কারণ, পিঁদাড়ির সঙ্গে একত্রে হাটে যেতে নাকি তাঁর লজ্জাই করে। ... — তবু মান অভিমান হলে নোলিতা পালা'র দ্বিজবরের মতো নারান দাশও কি আর পিঁদাড়ির উপর হম্বিতম্বি করে বলেন না—দে দে পিঁদাড়ি মোর ছাতা-বাড়ি দে, মু চলি যিমু?'' [২৭]

এইভাবে লেখকের চোখে দেখা চরিত্রগুলি আঁকা হয়ে গেল উপন্যাসের পটে। অকৃত্রিম ভালোবাসা আর গভীর বেদনায় লেখক কলম ধরেছিলেন। তাঁর চেনা জগতে বাস করা রোজকার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোধা চরিত্রগুলো অবশেষে হয়ে গেল চোর ছিনতাইবাজ কিছুতেই যেন বিশ্বাস করতে পারতেন না—

''চোখ বুজলে প্রায়দিনই দেখতে পেতাম ... কালো কালো তাঁবুর মতো লোধাদের ঝুপড়িগুলো চোখে পড়ত। কালো কালো মানুষগুলো কালো কালো বিন্দুর মতো যেন ঘুম ঘোরে এ-ঝুপড়ি থেকে সে ঝুপড়িতে যাচ্ছে। ঘোরের ভিতর আমিও লিখে ফেললাম 'শবর পুরাণ'।''

এইভাবেই রচিত হয়ে যায় এই সময়ের আখ্যান।

লেখক 'শবর চরিতে' কেবল শবরদের জীবনচিত্রই অংকন করেননি মূলস্রোতে ফিরিয়ে এনে সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। লোধা জাতির উৎস সম্বন্ধীয় লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন লোধাদের কণ্ঠেই। রাইবু বলে গুরভাকে—

'আমরা বিশ্বামিত্রের ছেলের ছেলে বটিন? বংশধর? জানিস কী আমরা অসুর?

''পল্লশব্‌রী'' বলে আমাদের এক দ্যাপতা আছে জানিস কী? ফুদিচন্দ্র বলে একজন

রাজও ছিল, নাম শনেছিস? শন্নিস নাই ত, শুন্নে রাখ। কামধেুনর গোবর থেকে আমাদের জন্ম, জানিস কী গুরভা? জানিস কি আমরা ক্ষত্রিয়।'

অরণ্যবাসী এই মানুষগুলো অরণ্যকে দেবতা জানে, গাছকে পুজো করে। ফরেস্ট অফিস, ব্যবসায়ী চক্র ওদের দিয়েই অরণ্য নিধন করতে চায়। না করলেও ওদের ওপরই সব দোষ বর্তায়। বৃক্ষসংক্রান্ত তাদের অনেক টোটেম-টাবু আছে। রাইবু বলে, 'বাবা বলত মানুষের থিক্যেও গাছ অনেক বড়। একেকটা গাছ আছে যার তলে, ছানুতে যেঞে উঁড়া, দেখবি তোকে কত ছোট লাগছে। সেইরূপ একটা গাছকে, মানুষ গাছকে তুই কী না কেটে ফেললি গুরভা?' জঙ্গলে ওদের অধিকার নেই, কিন্তু জঙ্গলকে তারা ভালোবাসে। তবু জঙ্গলের কাছে গেলে সবাই সোর তোলে—'হাটো, হাট্টো রাজার বাগান থিকে হাট্টো'। কিন্তু ওরা ভাবে—

'ই বাবা, জঙ্গলের জীব আমরা, সেই কুন্ মান্ধাতার আমল থিকে আছি, সত্য-তেরতা, দ্বাপরে ছিলাম, কলিতেও আছি ঘোর কলিতেও থাকব। জঙ্গলের ফল-পাকুড় সব তো আমদের! মাজন শুন্নো নাই মরবার কালে স্বয়ং ভগবান আমাদের জরাশব্বরকে কীই বলেছিল?'

এই তাদের বিশ্বাস কিন্তু সে-বিশ্বাসের তো জোর নেই, অধিকার নেই। জঙ্গলও তাই ওদের ছেড়ে দিতেই হয় সভ্যতার আগ্রাসনের ফলে। বঙ্কেশর মাহাতো সদর্পে বলে—

'জঙ্গল তোর বাপের, জঙ্গলের গাছ—পাল্হা-পতর ফল-পাকুড় সব তোর বাপের—তা বলে জোত-জমার ফল-পাকুড়েও হাত দিচ্ছিস কী বলে? দিচ্ছিস দিচ্ছিস, তাও সব দিন কেনে? নিয়ম ত ছিল একটাই—ছদিন আমরা, একদিন তোরা সেই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটালি কেনে'

—এভাবে কবেই যেন জঙ্গল ভাগ হয়ে গেছে। চলে গেছে ওদের হাত থেকে ক্ষমতাবানের অধিকারের গন্ডিতে। তবু ওরা মানতে চায় না, এ হিসাব ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। তাদের এই সবহারানো জীবনের ভেতরেও কিছু থেকে যায়, ক্ষুদ্র সম্ভাবনা—ভুবন-ফুলটুসির কন্যা নুকু লক্ষ্মীরাণী মল্লিকের উত্থান। নতুন চেতনার উন্মেষ। চরিত্রটি যেন চুনী কোটালের ভাবমূর্তিতে রচিত হয়েছে। তার নকু থেকে লক্ষ্মীরাণী হয়ে ওঠার প্রক্রিয়াটি অপমানের, দারিদ্র্যের, বঞ্চনার। শবরদের অস্তিত্বের বিপন্নতা সেই কৈশোরেই উপলব্ধি করেছে নুকু। স্কুলের হোস্টেলে বসে সে কবিতা লিখেছে, তবে শ্রোতার অভাবে সে কবিতা লোধাদের শোনাতে পারে না নকু, কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে। হয়ত তার কীর্তি থেকে যাবে।

বন মা

কুমারী লক্ষ্মীরাণী মল্লিক, দশম শ্রেণী

দরখুলির জঙ্গলে কপ্‌তি গুঁড়ুর পাখ ডাকে
চল্‌ রাণী চল্‌ মুনু পা ফেলাঞে একসঙে,
কেঁদ্‌-ভুঁড়রু পাঁকে আছে কুঁদরী-কাঁকড়ো ধরেঁ আছে
তুল্‌ রাণী তুল্‌ মুনু যত ইচ্ছা হাত ভরেঁ
বল্‌ রাণী বল্‌ মুনু একসঙে চেঁচাঞে—
কহেঁদে রাণী কহেঁদে মুনু, বন আমাদের মা বঠে॥ [২৮]

নকু স্বপ্ন দেখে তার কবিতার ছোঁয়ায় লোধাপাড়া আমূল বদলে গেছে। বস্তি নয় নগর সভ্যতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ঘরগুলি হয়ে গেছে পাকা, পিচ ঢালা রাস্তা, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, চালের গুদাম, কাপড়ের গুদাম, টিউবওয়েল, পার্ক, স্টেডিয়াম-শহরের সঙ্গে বাসের সংযোগ, লোধাবস্তি হয়ে গেছে লোধা স্টেডিয়াম। এ স্বপ্ন স্বপ্নই শুধু। নুকু চায় আলো জ্বালাতে, তার হাতের মোমবাতির মতো সমগ্র লোধাপাড়াকে সে আলোয় আলোময় করে তুলতে চায়। কোথাও যেন না জমতে পারে অন্ধকার। মূলস্রোতের প্রতিভূ শিক্ষক আদিত্যর সঙ্গে কলেজে পড়া লক্ষ্মীর সংযোগে উঠে আসে লোধাদের-আদিবাসীদের গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবন-কথা, ইতিহাস-ভূগোল-নৃবিজ্ঞান। তৃতীয় পর্বের অনেকটা জুড়ে আদিত্য কেবল লোধাদের অতীত সন্ধান করে চলেছে। উপেন কম্পাউণ্ডার তাকে একসময় স্মরণ করিয়ে দেয়—

> ‘‘... লোধা শবররা কোথা থেকে এল শুধু সেই দেখলে হবে না আদিত্য, বর্তমানে কোথায় আছে, ভবিষ্যতে কোথায় থাকবে,—এসবও দেখতে হবে আর এই দেখাটাই বড় দেখা।’’

জঙ্গল চলে যাচ্ছে লোধাদের থেকে দূরে, লোধারা জঙ্গল থেকে উৎখাত হতে চলেছে। সমালোচক বলেছেন—

> ‘‘একটি অচেনা পাখির ডাক, টি-উল টু-টু টি-উল টু-টু সতর্কবার্তার মতো আক্রান্ত বা বিপজ্জনক পরিস্থিতি বারবার শোনা যায়; ধ্রুবক এই ধ্বনিটি বিপন্নতার প্রতীকে উপন্যাস-ভাবনাকে সংহত করেছে।’’ [২৯]

আক্রান্ত সময়ের শিকার হয়েই ‘শবর রাজা’ রাইবুকে একসময় জেলে বন্দি হতে হয়। কিন্তু অপরিচিত পাখিটি টি-উল টু-টু টি-উল টু টু ডাক যেন এখন আরও স্পষ্ট কথা বলে, অন্য কিছু শোনাতে চায়, যেন বলে অধিকার অর্জনের সময় হয়ে গেছে। একটা সময়ের পর সকলকেই সে

অধিকার বুঝতে দিতে হবে। রাইবুরা তাই বিলুপ্ত হবে না। সচেতন হয়ে উঠবে আরও। তাদের চেতনার জগৎ বিকল্প আর এক চেতনার জন্ম দেবে। কাহিনির পর কাহিনি সেই 'ধরতাই' রক্ষা করে চলবে, চলতেই থাকবে। লেখক বলেছেন—

> ''সেই পথের দেবতাকে জীবনের দেবতাকে প্রণাম করে, সেই গন্ধ সেই 'নস্টালজিয়াকে সম্বল করে, সেই বিচ্ছিন্ন দ্বীপ, দ্বীপের আপামর অধিবাসী আত্মীয় পরিজন ভূগোল ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া জলবায়ু নদনদী পাহাড়-টিলা-বন-ডুংরি গাছপালাসহ তাবৎ ভূখণ্ডকে যতটুকু পারি প্রত্নতাত্ত্বিক আগ্রহে ও প্রচেষ্টায় খনন করে আবিষ্কার করতে চাই উপন্যাস রচনার অজুহাতে। উপন্যাসের আখ্যানভাগকে বাঁধতে চাই মহাভারত কী বিষ্ণুপুরাণের ঠাস বুনোটে। ...চাইতে হয় তো চাইব সেই উপন্যাস লিখতে যার শুরুটা আমি করব কিন্তু কালে কালে রামায়ণ মহাভারতের মতো 'ধরতাই' ধরবে পরবর্তী আখ্যানকারেরা, ...।'' [৩০]

বিয়োর

'নিম্নবর্গ' নতুন ব্যঞ্জনায় বিশ্লেষিত হয়েছে আমাদের আলোচনার এই পর্বে। 'বিয়োর' সেই নব ব্যঞ্জনার সার্থক দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটি প্রথম বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়। ২০০৮ সালের মে মাসের নন্দন পত্রিকায় এর প্রথম পর্ব প্রকাশিত হয়। লেখক বলেছেন '২০০৭-এর নভেম্বরে লেখার কাজ শুরু করে ২০১০-এর নভেম্বর লেখার কাজ শেষ হয়।' ইতিহাস-উপকথার সীমান্ত ছাড়িয়ে উপন্যাসটির আখ্যানভূমি তৈরি হয়েছে ভারতবর্ষের প্রান্তিক যাযাবর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি একটি জনজাতির বিধ্বস্ত প্রত্যাবর্তনের মধ্য দিয়ে। যাদের বসবাসের নির্দিষ্ট ভূমি নেই, রাষ্ট্রিক কোনো অধিকার নেই, প্রতিষ্ঠিত কোনো ভাষাও নেই। তাদের চলমান জীবন যেখানে গিয়ে ঠেকে সেটায় তাদের আশ্রয়। এর পূর্বে আমরা অভিজিৎ সেনের 'রহুচণ্ডালের হাড়' উপন্যাসের আলোচনা করেছি। 'বিয়োর'কে তার উত্তরসূরিও বলা যায়। তবে 'বিয়োর' দেখাল পূর্বপ্রেক্ষিতের নতুন চেতনার বিশ্লেষণ অবশ্যম্ভাবী। তাই নিরবলম্ব বাস্তবতা নয় মাঝে মাঝে গভীর আচ্ছন্নতা, যেন ম্যাজিক রিয়ালিজমের জগৎ থেকে উঠে আসা চরিত্ররা সব ভিড় করেছে বিয়োর উপন্যাসে। ঔপন্যাসিক শুভঙ্কর গুহকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল মার্কেজে-র উপন্যাসের জগৎ। লেখক তাই সহজেই গোষ্ঠী বা ব্যক্তির স্বপ্নদেখা জগৎ বা স্বপ্নভঙ্গের বাস্তবতাকে নিম্নবর্গীয় চৈতন্যের বিস্তার ও প্রতিচ্ছেদকে তুলে এনে বিরোধী ইতিহাস চেতনার স্ফুরণ ঘটিয়েছেন। বিকল্প বাস্তবের জন্ম দিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে লেখকের পথপরিক্রমণের ফলে বেদে সাপুড়িয়াদের এক বিরল জীবনকাহিনির সন্ধান পেয়েছে পাঠক।

বিয়োর শতাব্দী-প্রাচীন এক সাপুড়িয়া আর তার দলের বিপন্ন অস্তিত্বের সংগ্রাম-কাহিনি। বেদে সাপুড়িয়াদের জীবনদর্শন, তাদের ভাষা, উপার্জন পদ্ধতি, যাযাবরী বিচরণ, তাদের যাত্রাপথকে অবলম্বন করে বিচিত্র অভিজ্ঞতার জগৎ উন্মোচিত হয়েছে। সভ্য সমাজের কাছে সাপুড়িয়ারা অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য। গ্রামে গ্রামে সাপখেলা দেখিয়ে মানুষের বিনোদনই তাদের উপার্জন। তাদের নিজস্ব একটা জগৎ আছে, যাকে কেন্দ্র করে তারা বিচরণ করে, সে-জগৎ অলৌকিক ও অন্ধবিশ্বাসে ভরা আর যাদুবাস্তবতায় আচ্ছন্ন। বেদে ভাষায় 'মোশেল' কথার অর্থ সাপ আর বিয়োর মানে 'গর্ত'। 'মোশেল বিয়োর' মানে 'সাপের গর্ত'। সাপুড়িয়া দলের সর্দার শতাব্দী প্রাচীন কিরিটি সাপুড়িয়া তার এক অদ্ভূত আকাঙ্ক্ষার কথা তার দলকে, পুত্র কেদার সাপুড়িয়াকে বলেছিল। মৃত্যুর পর তাকে যেন পোড়ানো না হয়, মৃত্যুর পরও সর্দার তার দলের সঙ্গেই থাকতে চায়, তাই নতুন গড়ে ওঠা বেদে পাড়ার উঠোনের মাঝে তার জন্য একটা গর্ত খনন করে শুইয়ে দেওয়া হয় যেন তাকে। গর্তে যেন রাখা হয় তার সঙ্গী তারই মতো প্রাজ্ঞ প্রিয়তমা সাপটিকে যাকে সর্দার 'পয়গম্বর' বলে সম্বোধন করে। যে-গর্ত থেকে সর্দার একদিন উপার্জনের উপায় খুঁজে পেয়েছিল সেই 'বিয়োরে'ই সর্দার শেষ শয্যা পাততে চায়। এই তার অভিলাষ। প্রসঙ্গক্রমে লেখক জানিয়েছেন যুগ ও দেশকাল পরিবর্তনের সঙ্গে বেদেরা মাগান্তা জীবনযাপনের কোন পরিবর্তন হয় না। সাধারণের জগতের সাথে মাগান্তারা নিজেদের এখনও স্বচ্ছন্দে মানিয়ে নিতে পারে না। সেই আদিকাল থেকে তারা তাদের বিশ্বাস সংস্কার নিয়ে সাপের ওপর নির্ভর করে মাঠে-গ্রামে-হাটে-মেলায় ঘুরে ঘুরে অসহনীয় পদ্ধতিতে অন্ন উপার্জন করে। ১৯৭২ সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনের প্রয়োগের ফলে বেদে-সাপুড়িয়া বা মাগান্তারা আরও বিপন্ন হয়ে পড়ে। সাপকে কেন্দ্র করেই তাদের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ-সংসারজীবন-সংস্কৃতি ও ভাষা গড়ে উঠেছে। সাপ ছাড়া তাদের কোনো অস্তিত্ব নেই। লেখক সাপুড়েদের সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে বলেছেন—

> ''মাগান্তা বা মাঙতা কথার অর্থ—সাপখেলা, নেউলের খেলা, ভালুক-বাঁদর খেলা, ছুরি বা চাকুর বিপজ্জনক খেলা দেখানোর মাধ্যমে, গাঁয়ে গঞ্জে, হাটবাজারে অথবা রেলস্টেশনে যারা চেয়ে নেওয়া বা মেঙ্গে নেওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করে তাদেরই মাগান্তা বা মাঙতা বলা হয়। এরাই বেদে জাতির একটি অন্যতম প্রশাখা। মেঙ্গে নেওয়াই এদের জীবনদর্শন। প্রাচীনকালে এরা ছিল খাস বেদে বা বেদিয়া। এদের বলা হত 'চিড়িয়া মাগান্তা'। ছোট-বড়-মাঝারি বিভিন্ন আকারের দল ছিল। এক-একটি দলে সাতজন-দশজন সাপুড়িয়া দল বেঁধে থাকত। কোনো নির্দিষ্ট স্থানে বসবাস করত না, সারাদিন বিচরণের অবশেষে কোন মাঠের ধারে বা পথের পাশে গাছের নিচে অবশ্যই পুকুর-ডোবা বা নদী থাকতে হবে নিকটে, এমন একটি স্থান নির্বাচন করে, কাঠকুটো জ্বালিয়ে রান্না সেরে রাত্রিবাস করত। এদের না ছিল দেশ, গ্রাম ও ভিটা। দেশটার নাম

যে ভারতবর্ষ এবং তারা যে ভারতবাসী এই সেদিন পর্যন্ত জানত না। ভোটার তালিকাতেও এদের নাম ছিল না। বর্তমানে, চিড়িয়া মাগান্‌তা বা বেদে বলতে যা বোঝায়, এরা লুপ্ত হতে বসেছে।"

প্রখর তপ্ত গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে একদল সাপুড়িয়া ভাগীরথী নদীর ধার ধরে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত নবগ্রামের পূর্বদিকে বিলবোশিয়ার তীর ঘেঁষে প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটগাছটির নীচে তাদের যাত্রা থামায়। এখান থেকেই শুরু হয় তাদের ধারাবাহিক সংগ্রামের উপাখ্যান। এই পথ ধরে বহুকাল আগে হয়তো বহু যাযাবর দল পথ ভেঙে চলে গেছে ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত প্রান্তে। পটুয়া বেদে, রেশম ও সিল্ক কাপড়ের বেদে, মাটির ও কাঁচের পাত্র নিয়ে ফেরি করে বেড়ায়, এমন বেদে। তবে সাপুড়িয়া বেদে এই পথ ধরে যাতায়াত করে অধিকাংশ সময়। পথ তার চিহ্ন ধারণ করে রাখে। গরুর গাড়ির চাকার দাগ, হাঁড়ি-পাতিল-মাটির পাত্রের টুকরো, তাদের ব্যবহার্য অনেক খুঁটিনাটি অপাঙক্তেয় বস্তু। কোথাও থিতু হয়ে কিছুদিন বসবাস করে আবার চলে যায়। এই রকমই একটা ভাঙা দল নবগ্রামে এসে পৌঁছায়। দলে থাকতে পারে সাত আটজন, বারো তেরো জন আবার চোদ্দ জনও হতে পারে। এভাবে এক একটি দল এগিয়ে যায় পিছনে ফেলে আসে অনেক কাহিনি অনেক উপকথা, লোককথা, গাথা।

''বেদের দলটি বিলবোশিয়ার পাড়ে এসে থমকে দাঁড়াল। ছুটোছুটি করছিল দলের মেয়েরা। পুরুষগুলি লাঠিগুলি পাড়ে পুঁতে দিল। ফুটফুটে শ্যাওলা-ঝাঁঝির জল দেখতে পেয়ে স্বাভাবিক আনন্দে বিভোর হওয়ার কথা। ... বিলবোশিয়ার পাড়ে সামুদ্রিক ঢেউয়ের মতন, ফণিমনসা-উদ্ভিদের মাথার মতন ঢিবিগুলির মধ্যে গোখরো, কেউটে, দাঁড়াশ, চন্দ্রবোড়া আরও ভিন্ন প্রজাতির সাপের স্বর্গীয় আস্তানা। যারা বেদে সাপুড়িয়া তারা এই স্থানটিকে দেখে আকর্ষিত হয়। অসংখ্য ঝোপ জঙ্গলে, শুকনো পোড়া ঘাসের ওপরে বিস্তর সাপের খোলস ছড়ানো আছে। দৃষ্টি সতর্ক হলে, অসংখ্য সাপের চলে যাওয়ার দাগ দেখা যায়। বেদের দলটির উচ্ছ্বসিত হওয়ার কারণ, বিলবোশিয়ার শীতল জল না সাপের নিশ্চিন্ত বসবাসের কারণে?

পোশাকগুলি খুলে পুরুষগুলি পতাকার মতন উড়িয়ে দিল। হাওয়ায় পত পত করে বেদে পোশাকগুলি উড়তে থাকল মহাশূন্যে শকুনগুলি ঘুরপাক খেতে খেতে বহুদূরে কালির বিন্দু হয়ে অবশেষে মিলিয়ে গেল। বিলবোশিয়ার ধারে-ধারে জলপিপি ও ডাহুক আতঙ্কিত চিৎকারে ঘোষণা করল একদল মানুষ এসেছে। বেদিয়ার দল এসেছে।" [৩১]

এই দলটির সর্দার কিরিটি সাপুড়িয়া, তার বয়স শতবর্ষ পেরিয়েছে। এখন তার বয়স শক্তি ক্ষমতা তার সঙ্গে সহযোগিতা করছে না। সর্দার তাই তার দলের মধ্যেই চিরন্তন স্থায়িত্ব পেতে চায়। কিরিটি সর্দার তার পুত্র কেদারকে বলে তার মনের শেষ বাসনার কথা। 'আমাকে পুঁতে দিবি

কেদার। বড় করে গত্ত করবি গত্তের চারধারে গাছের ডাল দিয়ে বেড় দিবি। মাটি চাপা দিয়ে আবার গত্ত করবি। গত্তের মধ্যে দাঁড়াশ, গোখরো, কেউটে, চন্দ্রবোড়া বাসা বাঁধবে।' সর্দার জানে দল তাকে ছেড়ে চলে যবে একদিন না একদিন। কিন্তু সাপ, সাপের সঙ্গে তো তার জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তাই সাপ তাকে ছেড়ে যাবে না কখনো। তার বিয়োরে সাপ বাসা বাঁধবে তাকে সঙ্গ দেবে, মোশেল (সাপ) তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে অনন্ত কাল।

কিরিটির পর তার পুত্র কেদার হবে দলের সর্দার। দলের প্রতিটি সাপুড়িয়াকে সর্দার অথবা যারা পটু সাপুড়িয়া হয় তাদের কাছে ক্রমাগত শিক্ষা নিতে হয়। বেদিয়াজীবনে অবসরের বিলাস নেই, মেঘের মতন ভেসে বেড়াতে হয় সারাজীবন। গোখরো, কেউটে, কালাচিতি প্রভৃতি সাপের ঝাঁপি বয়ে বেড়াতে হয় সারাজীবন, যা দলের সম্পত্তি বলে পরিগণিত। কিন্তু দলের সর্দার হওয়ার জন্য ব্যক্তিকে বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হতে হয়। শঙ্খচূড় সাপকে বশ মানানো বা তাকে ঝাঁপিতে ভরা সবচেয়ে কঠিন কাজ। আর শঙ্খচূড় না ধরতে পারলে দলের সর্দার হওয়া যায় না। সর্দারের অক্ষমতাও আছে। সাপ ছোবল মারলে তার চিকিৎসা কিন্তু সাপুড়িয়া জানে না। ওরা ওঝা নয়। ওঝা আর সাপুড়িয়া সম্পূর্ণ আলাদা। ওঝারা যাযাবর হয় না, বেদিয়াও হয় না। মানুষের শরীরের অস্থিরতা আর অসুস্থতা থেকেই ওঝাদের আয়। আর সাপুড়িয়া আয় করে সাপ খেলা দেখিয়ে, দোষ তাড়িয়ে, শিকড়মূল বিক্রি করে। সাপ ধরা সাপের বিষদাঁত ভাঙা, গর্ত করে মাটির নীচে বিষ পুঁতে দেওয়া বা বিষ বিক্রির কাজও তারা করে। সাপকে জ্যান্ত পাখি চড়াই ইঁদুর ধরে খাওয়ানো এসবই তাদের কাজ।

> ''এই যাযাবর বেদিয়া দলের মূল্যবান সম্পত্তি বলতে দুটি বলদ, আর একটি গোযান। ঐ গোযানটিই ইঙ্গিত করছে, ইঙ্গিত করছে শুধুমাত্র একটি উনুন, গোটা দলটি এতগুলো মানুষ নিয়ে—একটি দল। উনানের আঁচ তেলার চেষ্টা চলছে, বাতাসের জন্য উনানের কপালে আগুন আসছে। পোড়া কালো টিনের পাত্রগুলি ছড়ানো, কাপড়ের বোঁচকা বুঁচকি, বোঁচকা-বুঁচকির ওপরে পুঁতির মালা ছড়ানো খান কুড়ি ঝাঁপি, আড়বাঁশি, বীণ, শাবল, খন্তা, শিক এমন নানান আয়োজনের মধ্যে ময়লা-গুদুরি বেদেদের শয্যা।'' [৩২]

কিরিটি সাপুড়িয়ার দলটি যে বিবিরপুকুরের কোড়া আদিবাসী সম্প্রদায়ের ধ্বংসস্তূপের ওপরে প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটের তলায় আশ্রয় নিয়েছিল। সে-জমিটি নবগ্রামের মতব্বর দীনুদয়ালের খাস জমি। দীনুদয়াল বন্ধকীর কারবার করে, চড়া সুদে ঋণ দেয়। ডাকাতির মাল কম দামে কিনে মজুত করে। ডাকাতদলের সঙ্গে তার গভীর সংযোগ আছে। এরকম নানান পেশা তাকে চতুর করেছে। আর আর্থিক বলে বলিয়ান হওয়ার জন্য গ্রামবাসী আপনা থেকেই তাকে মাতব্বর বলে মেনে নিয়েছে। আর একটু বয়স হলে হয়তো সেই হবে গ্রামের মোড়ল। সে গ্রামের নানা সমস্যার সমাধানকারী এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি। নবগ্রামে দোকানদারি করে রামলঘু, ডাকাতির খবরও

সরবরাহ করে দীনুদয়ালের কাছে। চতুর লোক বিবির পুকুরের পাড়ে প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটের নীচে যে-জমিতে সাপুড়িয়া আস্তানা করেছে সে-জমিটির ওপর আছে রামলঘুর নজর। তাই এই জমিতে সাপুড়েরা আস্তানা করেছে শুনে রামলঘু তাদের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগে। দয়ালকর্তা দীনুদয়ালের কাছে নালিশ করতে যায়। সাপুড়িয়ারা এত খবর রাখে না। সভ্য সমাজের চক্রান্তের সঙ্গে তাদের কোনো সংযোগ নেই। এসব যে তারা বোঝে না এমন নয়, তবে তাদের জীবন প্রবাহিত হয় স্বতন্ত্র খাতে। মেঘের মতন ভেসে বেড়ানোয় তাদের জীবন, তাড়িয়ে দিলে অন্য কোথাও চলে যাবে। এসব নিয়ে তারা তাই বিশেষ কিছু ভাবে না। ঘটনাচক্রে মাতব্বর দীনুদয়ালকে নির্বিষ কোনো সাপে কামড়ায়। নবগ্রামে সাপের ছোবলের কোনো চিকিৎসা হয় না। গোখরোর ছোবলে কুড়ি পঁচিশ মিনিটে আর কেউটের ছোবলে মাত্র ষোল মিনিটের মধ্যেই একটা জীবন শেষ হয়ে যায়। নবগ্রামে সাপ কামড়ালে কেউ ফেরে না। কিরিটি সর্দারকে নিয়ে আসা হয়। সর্দার চিহ্ন দেখে বুঝতে পারে বিষহীন মোশেল (সাপ) কামড়েছে দীনুদয়ালকে তবুও কিরিটি সর্দার ঘোষণা করে কেউটে সাপ। আর শুরু করে দেয় বিষ নামানোর পদ্ধতির অভিনয়। একসময় ঘোষণা করে 'বিষ নাই গো আর বিষ নাই। এ যাত্রা উদ্ধার হল গো ভগবান, উদ্ধার হল'। কারণ সাপুড়িয়া সর্দার জানে সাপ যত বিষাক্ত হবে বিষ নামাতে পারলে সাপুড়িয়ার আদর তত বেশি হবে। তাই এই মিথ্যার আশ্রয় তাকে নিতেই হয়। তাছাড়া যাযাবর জীবনের অভিজ্ঞতায় সাপুড়িয়া সর্দার বুঝেছে, এই দুনিয়ার মিথ্যার কারবারি সকলেই। সকলকেই আপন পেশায় কখনো না কখনো মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়। তাই কিরিটি সর্দার পুত্র কেদারকে বলে—'আমিও কেউটে বলে কোনো ভুল করি নাইরে ল্যালো (পুত্র), দুনিয়া—সংসার রণপায়ে উড়ছে, চলছে। নবগ্রামের ভগবান রণপায়ের কারবারি'। ডাকাতেরা ডাকাতির সময় পথ সংক্ষিপ্ত করবার জন্য রণপা ব্যবহার করত। ডাকাতদের মদত দিত দীনুদয়াল। মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে দয়াল কর্তা আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে। তার ধারণা শতবর্ষ প্রাচীন সাপুড়িয়া সর্দারই তার জীবনে এই বদল এনেছে। দীনুদয়ালের মনে একটা বাসনা জাগে প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটের তলায় সাপুড়িয়ারা যে জমিতে তাদের অস্থায়ী আস্তানাটি গড়েছে সেখানে তাদের স্থায়ী বসতি গড়ে তুলে দিতে, একটি বেদে পাড়া প্রতিষ্ঠা করতে। এই জমিতে চাষ হয় না জমিটা অনাবাদি। এখানে বেদেপাড়া প্রতিষ্ঠিত হলে গ্রামবাসীও সাপের ভয় থেকে নিস্তার পাবে, আর সর্দার সাপুড়ের প্রতি-উপকারও করা হবে। এই তার ইচ্ছা।

গ্রাম-জনপদ থেকে বহু দূরের এই অস্থায়ী বেদেপাড়ার মানুষগুলোর প্রতি গ্রামের মানুষের জন্মগত ভীতি আছে। যেমন তারা সাপকে ভয় করে তেমন সাপুড়েকেও। সাপুড়ে গ্রামবাসীদের কাছে অস্পৃশ্য ঘৃণ্য। বেদেপাড়া নিয়ে গ্রামবাসীরা মনগড়া কিছু সংস্কার গড়ে তোলে। শতমূল, ঈশ্বরমূল, লতানো তেঁতোমূল, এইসব গ্রামবাসীরা আকছার দেখে অথচ এই মূলগুলি সাপুড়িয়াদের

কাছে দেখলে তারা ভয় পায়। গ্রামবাসী কল্পনা করে সাপুড়েরা তুক্‌তাক জানে, কোনো মানুষকে ইচ্ছে করলে খাটো আকারের করে দিতে পারে, গৃহশান্তি নষ্ট করে দিতে পারে। তাই গ্রামবাসী সাপুড়েদের বসতি থেকে বহু দূরে থাকে। দীনুদয়ালের বিষ নামিয়ে কিরিটি সাপুড়ে গ্রামবাসীদের যে-আস্থা অর্জন করেছিল তা ক্রমশ ক্ষয়ে গিয়ে সাপুড়েদের সম্পর্কে পুরোনো ধারণাটিই তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। নবগ্রামে কিরিটি সাপুড়িয়ার এই অস্থায়ী ডেরাটি তাই নবগ্রামের গ্রামীণ নিসর্গর মধ্যিখানে ভেসে ওঠা একফোটা কালির দাগের মতোই বিরাজ করে—'গ্রামীণ গৃহস্থ-গৃহস্থীরা সাপুড়িয়াদের সহজে উঠোন ডিঙোতে দেয় না ভিটে ঘরের কাছে। খেলাই হোক, শিকড় মূল নিয়ে কাজকম্মই হোক, দূরে বসেই করতে হবে। শুভ কাজে উপস্থিতি কারও কাম্যও নয়'। দীনুদয়াল তার পুত্র দেবীপ্রসাদের বিবাহে সাপুড়েদের নেমন্তণ করলে, রামলঘু, মোহিত, রাধানাথ, বরেণ, মদন, রাখাল প্রমুখ ভদ্র গ্রাম্যব্যক্তিরা জানিয়ে দেয় সাপুড়িয়ারা এলে তারা আসর পরিত্যাগ করবে। বেদেদের সঙ্গে একসাথে বসে তারা খাবে না কখনও।

সাপুড়েরা সকালবেলা সাপ ধরার কাজে বেরোয়। সন্ধ্যায় ফিরে সর্দারকে জানাতে হয়, কটা কেউটে, কটা চন্দ্রবোড়া তারা ধরতে পেরেছে। সর্দার এখন বৃদ্ধ তাই সে সারাদিন সাপুড়ে ছা-ছানাদের সাথে আস্তানাতেই থাকে। আস্তানায় বসে সন্ধান চালায় সওদাগরের। এখান থেকেই সাপ কিনে নিয়ে যায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষজন। মাগান্‌তা বা বেদেদের নির্দিষ্ট কোনো ধর্ম নেই। এরা হিন্দু নয় মুসলমানও নয়। একই পরিবারের একটি সন্তানের যদি হিন্দুনাম হয় তবে অন্যটির মুসলমান নাম হতে পারে। এরা হরিনাম করে তো কখনও আবার নামাজও পড়ে।

> ''কিরিটি সাপুড়িয়া নামক বেদিয়া সর্দারের মূল কাণ্ড থেকে ছড়ানো বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা, কেদার, রহমৎ, জলিল, গৌরাঙ্গ, নালু। একই বেদিয়া সংসারে হিন্দু মুসলমান নামের সমাহার। কোন নির্দিষ্ট ধর্মবাদের ওপর বেদিয়াদের কী যায় আসে? ওরা অনুকরণবাদী। অনুসরণের শিক্ষা ওদের জানা নেই। ওরা সংঘবদ্ধতায় বিশ্বাসী। বিচ্ছিন্ন হতে জানেও না। দলা পাকিয়ে বসবাসে অভ্যস্ত সেই মাগান্‌তা যুগ থেকে।'' [৩৩]

সাপুড়িয়া জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে বহুকাল আগে নিজেদের রাজ্য থেকে বিতাড়িত হওয়ার বেদিয়া কাহিনি বা কাল্পনিক কিছু উপকথা। বর্তমান বেদিয়াদের প্রাচীন রাজা ছিলেন হুগলীর ধনেখালিতে। তিনি ছিলেন সাপেদের বন্ধু, সাপকে তিনি 'দেমূল' অর্থাৎ ভগোবান মনে করতেন। নিজের রাজ্য থেকে 'মোশেল' অর্থাৎ সাপ ধরে তিনি নিবেদন করতেন 'চারকোথ' অর্থাৎ কালীদেবীকে। সভ্যরাজারা এই বেদিয়ারাজাকে বিষধর, অসভ্য, আঁশটে আখ্যা দিল, 'মোশেলে'র রাজত্ব তারা ভাঙতে চাইল। তাই সবাই মিলে আক্রমণ করল বেদিয়া রাজত্ব। পরাস্ত হয়ে বেদিয়া রাজা একদিন মনের দুঃখে আড়বাঁশি, বীণ, শাবল, ঝাঁপি, শিক এবং তার দলবল

নিয়ে পথে নামল। গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাপখেলা দেখিয়ে, শিকড়-মূল-ওষুধের মাহাত্ম্য প্রচার করে নানাবিধ উপায়ে উপার্জন করতে থাকল। সেই থেকে তারা যাযাবর। অন্য আর একটি কাহিনিও প্রচলিত ছিল। বেদিয়া মাগন্তা রাজা ছিলেন বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত। বেদিয়া জনজাতিকে গুপ্ত ভাষায় 'মাঙতা' বা মাগান্তা' বলা হয়। বেদিয়ারা যে-ভাষায় কথা বলে সে-ভাষা তিনিই প্রচলন করেছিলেন। বেদিয়ারা সে-ভাষা নিজেদের মধ্যে সংগোপনে ব্যবহার করে। তার কোনো লিপি নেই। ওদের ভাষা ওদের মুখে মুখেই প্রচলিত আছে। এই মাগান্তা রাজা পরবর্তী কালে কোনো এক রাজার গুপ্তচর নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই মাগান্তা রাজার অপরূপা সুন্দরী চারটি কন্যা ছিল। গুপ্তচর বৃত্তিতে যাদের জুড়ি মেলা ভার। গুপ্তচর বৃত্তির জন্য মাগান্তা রাজা ও কন্যারা একটি প্রতীকী ভাষা ব্যবহার করতেন। অন্যদের সামনে বললেও কেউ তার অর্থ বুঝতে পারত না। যে রাজার আশ্রয়ে এই মাগান্তা রাজা ছিলেন তিনি অন্য রাজার দ্বারা আক্রান্ত হন এবং পরাস্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। তখন মাগান্তা রাজা স্ত্রী কন্যাদের নিয়ে পথে নামেন, সঙ্গী হয় সাপ। যাযাবর জীবনে অভ্যস্ত হয়ে যান। তাঁর স্ত্রী কন্যারা ছিলেন রাজরমণীদের মতো পণ্ডিত ও নৃত্যপটিয়সী এবং সাহসী আর পাকা লাঠিয়াল। শিকড় বাকড়ের মাহাত্ম্য বুঝতে এদের জুড়ি মেলা ভার। মাগান্তা রাজা মূলত ছিলেন অনুকরণবাদী। মুসলিমদের উৎসবে তিনি নামাজ পড়তেন আবার হিন্দুদেবদেবী আরাধনার খুঁটিনাটি নিয়মকানুন জানতেন। তাই তাদের কোনো নির্দিষ্ট ধর্ম ছিল না। উপাসনা ও পুজোকে তিনি সমান শ্রদ্ধা করতেন। সমগ্র এশিয়া মহাদেশ ঘুরে বেড়ানোর অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। একশো বছর ছিল তাঁর আয়ু। ক্রমে সেই রাজার বংশ বৃদ্ধি হয়। ভিনদেশী যাযাবর বেদিয়া সর্দারদের সঙ্গে তাঁর কন্যাদের বিবাহ হয়। সাপ, বীণ, আড়বাঁশি, নেশাভাঙ, তুকতাক, মন্ত্রসাধন ও বিলাসী জীবনযাপনের সঙ্গে সঙ্গে তারা নানা দলে ভাগ হয়ে বিচরণ করতে থাকল। ভালুক-বাদর-সাপ খেলা দেখিয়ে মেঙ্গে-মেঙ্গে নিজেদের পরিচিত গড়ে তুলল 'মাঙ্গাতা'। এই ছিল বেদিয়াদের মাগান্তা হয়ে ওঠার ঐতিহাসিক কাল্পনিক কাহিনি। যা তারা ধারণ করে, বহন করে নিয়ে চলে যুগে যুগে, দলে দলে।

এই রকমই একটি দল একটি জনজাতি সর্দার কিরিটি সাপুড়িয়ার দল। ওদের কাছে এখনও সাপই সব। সাপ দেবতা, সাপ আত্মীয়, সাপ প্রিয়জন। সাপ আছে বলেই ওরা বেঁচে আছে। দীনুদয়ালের দয়ায় তারা পেয়ে গেল স্থায়ী বাসস্থান নির্দিষ্ট ভূখণ্ড। মাটির সঙ্গে ওদের সম্পর্ক স্থাপিত হল, আস্তে আস্তে ওরা একদিন হয়তো গৃহস্থ হয়ে উঠবে। দীনুয়দালের সহায়তায় সাপুড়েরা একদিন মাটির কুঁড়ে তৈরী করতেও শিখল।—

> ''... সেদিন থেকে ক্রমে ক্রমে আর্থিক যোগান অনুযায়ী কোনোরকমে ছাউনি গড়েছে, মাটি ল্যাপা উঠোনে বকফুল ও আমগাছ পুঁতেছিল সেই গাছগুলি এখন ফুল ফল দিচ্ছে

... বেদে আস্তানা বা সাপুড়িয়া আস্তানা নামটি কবে যে মুছে গেছে, প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটের তলাটি যেন উড়ে এসেছে নবগ্রামের অনেক কাছে, বিবির পুকুরের সেই চিরকালীন নিঃসঙ্গতা মুছে গেল। মাটির তলায় চাপা পড়ে যাওয়া সেই কবেকার কোড়া সম্প্রদায়ের বসবাসের আদিম চিহ্নটি ঘুমিয়ে পড়ল আবার নবগ্রামের পূর্বদিকে সোজাসুজি বেদে পাড়াটি আয়তনে সীমাবদ্ধতা অর্জন করল।" [৩৪]

এভাবেই এক জনজাতি যায় আর এক জনজাতি আসে কিন্তু সভ্যতার ইতিহাস সে-কাহিনিকে ধারণ করে না কখনো, সে-কাহিনি কেবল এই যাযাবর মানুষগুলির কল্পনার বিনির্মাণে মুখফেরতা হয়ে বেঁচে থাকে মাত্র। এক সময়ে প্রয়োজনের তাগিদেই এই বিরোধী ইতিহাসের অনুসন্ধান করা যখন একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। যখন আর অস্বীকার করার উপায় থাকে না, তখনই শুরু হয় প্রত্নখনন। লেখা হয় বিয়োরের মতন উপন্যাস। এদেশ তাদের নয়, তারা এদেশের কেউ নয়, তাদের কোনো গ্রাম নেই, পাড়া নেই, তল্লাট নেই। যাত্রাপথেই মাগান্‌তার জন্ম, যাত্রাপথেই মাগান্‌তার মৃত্যু। বাঁচার আনন্দেই তারা বাঁচে তবুও সংকটময় ঘন অন্ধকার গভীর রাতে এই জীবন্ত গ্রহ-পিন্ডটিতে বেদিয়া দলটি ভীষণ একা হয়ে যায়। দল তখন সর্দারের কাছে চায়—'তুই আমাদের 'নুডলেখোগ' (মাটির কুটির) দে, না হলে বিচরণ দে'। এভাবে একস্থানে থেকে মাগন্‌তা জীবন বিসর্জন দিতে তারা পারবে না। সর্দার দীনুদয়ালের কাছে আবেদন করতে বাধ্য হল—'জমি যখন দান করলেন, উপয়াও দান করেন। মাটির দেয়াল তোলা জানালার ফোকর টানা, এইসব কি আমাদের কাজ। সাপুড়িয়া আড়বাঁশিতে সুর তুলতে জানে, সাপ শিকার করতে জানে, সাপের বিষ লামাতে জানে, তাবিজ কবজ মাদুলি-শিকড়-মূলের মাহাত্ম্য জানে, সাপের ঝাঁপি বুনতে জানে কিন্তু, মাটির কুটির তৈরী করতে তো জানে না।'—'সাপুড়িয়া সর্দারের এই উক্তির সাথে সাপুড়িয়া বেদেসমাজে নেমে এসেছিল, ঐতিহ্য ভাঙনের অধ্যায়। পোড়া উনুনকে পিছনে ফেলে, পোড়া পাতিল ভেঙে ফেলে, পথ চলার গতিকে থামিয়ে সেই চৈত্রে আশ্রয় নিয়েছিল প্রাচীন ঈশ্বরীয় বটগাছটির নিচে, মহাপ্লাবন পার করে, গাছ থেকে নেমে সেদিন একশো দশ বছর পার করেছিল।

নবগ্রামের দলটির মাগান্‌তা জীবনের যাত্রা শেষ হয় এখানে এসে। দল এখন স্থবির। একটি গ্রাম মাত্র। কিন্তু গ্রাম দিয়ে কী হবে? গ্রামে থাকে গ্রামবাসী (গেল)। সাপুড়িয়াকে অন্ন উপার্জনের জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতে তো হবেই। 'মজমায়' তাদের যেতেই হবে। মজমা (সাপ খেলা দেখানো) করতে না গেলে উপবাস। বেদে দল যখন বেদেপাড়া স্থাপন করল তখন তাদের পূর্বের যাযাবর জীবনের কিছু বদল অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। দলে সর্দার থাকা সত্ত্বেও এতদিনের নিয়মে কিছু বদল ঘটল। দলে অনেক মানুষ থাকলেও রান্নার জন্য ছিল একটিই 'আঁখাখোঁকা' (উনুন)। কারণ দলে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু ছিল না। সাপের ঝাঁপি যা ছিল সবই দলের, উপার্জন যা ছিল সবই

দলের। তা নিয়ে প্রথম বিরোধ দেখা দেয় জলিল বেদে ও তার স্ত্রী ফাল্গুনী বেদেনির মনে। ওরা প্রথম দলে দুটি 'আঁখাখোঁকা' তৈরি করে, দলে ভাঙন ধরে। দলের নিয়ম ছিল, দলের মধ্যেই জন্ম, দলের মধ্যেই বিবাহ, দলের মধ্যেই সন্তান উৎপাদন, সংখ্যা বৃদ্ধি। সাপুড়িয়া মজমায় যাবে যা উপার্জন হবে তা সর্দারের সামনে মাটিতে রাখবে, সর্দার ঝাঁপিতে তুলে রাখবে। কিন্তু দুটি উনুন মানে সর্দারের এত দিনের স্বপ্নের ভাঙন। দুটি উনুন মানেতো দুটি হাঁড়ি। সর্দার দেখলো—

> ''দুইটি ধোঁয়ারেখা শূন্যে অনেক উঁচুতে, প্রাকৃতিক নিয়মে মিলন ঘটে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক নিয়মের ধোঁয়াকে ভেন্ন করবে, এমন কার ক্ষমতা? কিন্তু গোড়াতেই যে ধোঁয়ারেখা ভেন্ন হয়, উচ্চতায় মিলনের কি দাম আছে? ... এই মহানদীর মতন মানব জীবনে কত সাপুড়িয়া সে দেখেছে। কেউ গর্তে, কেউ কবরে, কেউ কোনো অচেনা বনাঞ্চলে পুড়ছে আবার ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে মান্দাসে। এরা সবাই দলের মাগান্তা ছিল, এই দলে থেকেই মজমা করেছে, যা কিছু করেছে, দলের। দল ভিন্ন ওদের কোন মজমা ছিল না, ছিল না দল ভিন্ন কোন সাপের ঝাঁপি।'' [৩৫]

এ নিয়মের কোন বদল হয়নি, হওয়ার প্রয়োজন হয়নি কত যুগ। কিরিটি সাপুড়িয়ার 'খাপতে (পিতা) ভবানী সাপুড়িয়া, ভবানী সাপুড়িয়ার খাপতে চন্ডী সাপুড়িয়া, চন্ডী সাপুড়িয়ার খাপতে রাবণ সাপুড়িয়া। এই সকল দলের সর্দারদের আমল থেকে চলে আসছে এই প্রথা। কিন্তু এরপর দলের মধ্যে যত দিন যাবে 'আঁখাখোঁকা' বাড়বে, সাপের ঝাঁপি আলাদা হবে, দলের কোনো ঝাঁপি থাকবে না। সাপ, খন্তা, শিক সব আলাদা আলাদা। টাকা পয়সাও হবে নিজের নিজের। দলে তখন সর্দারও ভাগ হয়ে যাবে। ছোট সর্দার, বড় সর্দার। তবু গ্রামসমাজে তারা আসন পাততে পারবে না কোনোদিন। গ্রামসমাজের পুকুর-ঘাটে কোনদিনও নিজেদের অপবিত্র ছায়া ফেলতে পারবে না। জগতের কতকগুলো ছায়াহীন মানুষ হয়েই ওরা বেঁচে থাকবে। জলিল, নালু, কেদারকে এ অসম্মান বুকে নিয়েই মজমা করে যেতে হবে, পেটের দায়েই।

> ''দলের মধ্যে কেদার ও জলিল এই দুজনার মজমার জুড়ি নাই ... কল্পনায় দেব দেবীর কথা এমন বলল, উপস্থিত গ্রামবাসীদের চোখ ছল ছল করে উঠল। আর সব কাহিনিই গড়ে ওঠে মোশেল বৃত্তান্ত নিয়ে। জলিল, কেদার জানে খেলা দেখাতে দেখাতে সাপের প্রাণের তল স্পর্শ করতে হয়। সাপের ফোঁস ফোঁস তখন আদর হবে। গোখরো স্নেহশীলা হয়ে ওঠে। নালু বাজায় আড়বাঁশি, আড়বাঁশির সুরে জলিল নাচিয়ে তুলবে তার গান 'মায়ের কিখ্যানে কালিনাগ বাসরে সেঁধিলরে ... লখিন্দরের হল বিধিবাম ... মা কাঁদে, বাছা বলে ... ভগিনী কাঁদে ভাই ... অভাগিনী বেহুলা কাঁন্দে আমার কেহ নাই ...''

—সাপুড়িয়ারা মূলত ভাবাবেগে কথা বলে। তাদের আবেগ-প্রবণ কথাবার্তা গ্রামবাসীর মনকে স্পর্শ করে। সাপ খেলানো, গান গাওয়া, বাঁশি বাজানো আর তার সঙ্গে আবেগে বলে চলে

মাগান্‌তা জীবনের করুণ কাহিনি। সাপের আর সাপকে উপজীবিকা করে বেঁচে থাকা বেদেদের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য জীবনধারণ পদ্ধতি। ওদের আড়বাঁশির কম্পনের সাথে উঠে আসে বহুযুগের আগের সেই বিষণ্ণ রাত্রির করুণ সুর যেদিন সব হারিয়ে মাগান্‌তা রাজা ফকির হয়ে অপরূপা কন্যাদের হাত ধরে নেমে এসেছিল সিন্ধু নামক স্থানের পথে প্রান্তরে। তারপর কত মাগান্‌তা ভালুক, বাঁদর, হাতি, উট, কুকুর, ধনেশ পাখি নিয়ে পথে নামল। কেউ সাপের ঝাঁপি, কেউ নেউল, কেউ শিকড় মূল তাবিজ কবজ তো কেউ কাচের চুড়ি, আবার কেউ বা গ্রামের পথে হাটে বাজারে মেলায় হাতের জাদু দেখাতে আবার কেউ রূপার কাঠি তামার কাঠি নিয়ে ঘুরে ঘুরে মানুষের কানের ময়লা পরিষ্কার করতে নামল।

সাপুড়িয়াদের দেবতা বলতে সিঁদুর মাখানো একটি পাথরের খণ্ড যাকে ওরা 'হাঁড়িরাম ঠাকুর' বলে। শিকারে বা সাপখেলা দেখানোর সময় তাকে স্মরণ করে। ওরা ওদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সর্দারের নির্দেশ মেনে চলে। গ্রামের বাইরে যখন খেলা দেখাতে যায় তখনও ওরা নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব যেমন ধরে রাখতে চায় তেমনই মানুষের মনে ওদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণাকেও দূর করতে চায় অন্য জাতির সঙ্গে নিজেদের তফাতটা বুঝিয়ে দিয়ে—

> ''মাগান্‌তা সাপুড়িয়া, আমরা সাপুড়িয়া বেদে, মাগান্‌তা সমাজের বাইরে বৈদ্যরা হল গেল (অনাত্মীয়), গেলদের (অনাত্মীয়দের) আমরা শিকড় মূল-পাতার যোগান দিব না। দিব না মোশেলের গালি (সাপের বিষ)। বৈদ্যরা লাভের লোনাপনায় আমাদের মজমার (কাজের) গোপনীয়তা জানার চেষ্টা করে। প্রাচীন কালে ওঝা-বৈদ্যরা আমাদের কাছ থেকে মজমা (কাজ) শিখে নিয়ে আমাদের আর গণ্য করত না। দলের কোনো সাপুড়িয়া যদি ওঝা-বৈদ্যদের শিকড়-মূল-বিষ বিক্কির করে, তাহলে তার বিচার হবে। আমরা আমাদের সর্দারের কাছ থেকে, সাপের বিষ বার করার কাজ শিখেছি। আমরা ওঝা-বৈদ্যদের কেন দান করব? আমাদের ঈশ্বর হাঁড়িরাম ঠাকুর আমাকে জানাল,—গেলদের (অনাত্মীয়দের) সমাজ তোদের স্বীকার করে নিলে, আমি আর তোদের উঠানে দেবতা হয়ে থাকব না। গেলদের সমাজে অনেক বড় বড় দেবতা আছে। বেদিয়া মাগন্‌া দেবতাকে পুজতে যাবে কোন দুঃখে।'' [৩৬]

ওদের দেবতা ওদেরই মতো প্রান্তিক। তাই প্রসন্ন চক্রবর্তীর নির্দেশ সত্ত্বেও গ্রামের পূজারি কোনো ব্রাহ্মণ বেদেপাড়ায় এসে দেবতার পূজা করতে চায় না। নবগ্রামে বেদেপাড়া স্থাপিত হলেও গ্রামবাসী তা সহজে মেনে নিতে পারে না। আর তিন বিঘা জমির লোভ রামলঘু ছাড়তে পারে না। তাই তার বহুদিনের আদর যত্নে পোষা এই জমিটির লোভের আশায় যখন সাপুড়িয়া সর্দার জল ঢালে তখন সে গ্রামবাসীকে বেদেদের বিরুদ্ধে উস্কানি দিতে শুরু করে। তার প্ররোচনায় গ্রামবাসীরাও মনে করল, গ্রামের মধ্যে বেদেদের আসা যাওয়ায় গ্রামবাসীর অমঙ্গল হবে। বেদেরা গ্রামের পুকুর ব্যবহার করলে অনাচার ঘটে যাবে। বেদেদের কারণে বটগাছের মাথায় শকুন বাসা

বাঁধে, গ্রামের উপর অমঙ্গলের ছায়া ফেলে। গ্রামের গাভী বখনা প্রায় খোয়া যাচ্ছে। বেদেদের শুয়োর গুলি গ্রামের সীমানায় ঢুকে যাচ্ছে। এসবই তাদের ক্ষোভের কারণ। গ্রাম তাই এই অস্পৃশ্যদের অনধিকার প্রবেশ কিছুতেই মানবে না। তবুও একদিন ঈশ্বরীয় বটগাছটির স্থানটি এবং বিবিরপুকুরটি অস্পৃশ্যতার শিকার হল। দয়াল কর্তার বিরুদ্ধেও তারা যেতে পারে না তাই সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। একদিন জলিল বেদের কন্যা ফতিমা গ্রামের চাপাকলের জল কলসিতে ভরছিল কিন্তু সে তো অচ্ছুৎ অস্পৃশ্য এ তার স্পর্ধা, সে-স্পর্ধা গ্রামবাসী মানবে কেন। তাই গ্রামলঘুর ভাই সহদেব ও অন্যান্য গ্রামবাসী কয়েকজন মিলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কলসি ভেঙে দেয়, পড়ে গিয়ে তার কপালে গভীর ক্ষত হয়ে যায়, যার দাগ সে সারাজীবন বহন করে। এই ক্ষতই হয়ত বা একদিন শীতল-ফতিমাকে দল ছাড়া করে দেয়। সুদূরের আহ্বানে, অন্য জীবনে বাঁচার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে মিশে থাকে এ অপমানও। তবু সরল সাপুড়েরা এ অত্যাচারের জন্য কাউকে দায়ী করে না, বলে—'আমাদের জন্মের সময় ঈশ্বর আমাদের কপালে পোড়া কয়লার দাগ দিয়ে পাঠান। আমরা সেই পড়া কপাল নিয়ে দেশ দেশান্তরে, গ্রামপল্লী চড়ে বেড়াই। আচ্চা কত্তা বলেন তো, আমাদের কি ইচ্ছা করে না গ্রামে থাকতে?'

সাপ সম্পর্কে তাদের সংস্কারমুক্ত বিজ্ঞানমনস্ক ভাবনার যে-প্রকাশ ঘটে তাও গ্রামবাসী মানতে পারে না। সর্দার বোঝে, 'আমরা অস্পৃশ্য। আমরা গ্রামসমাজে সত্য কথা বলার কে?' তবুও দীনুদয়াল, রাধামাধব, প্রসন্ন চক্রবর্তীর হস্তক্ষেপে ওরা টিকে গেল তবুও সর্দার প্রশ্ন করে—'আমরা মাগান্‌তা, আমরা ছোটজাত, আমরা অচ্ছুৎ, আপনাদের গৃহ-দরবারে আমাদের প্রবেশ নাই। কিন্তু পানির কী দোষ? ছোট জাতের কলসিতে পানি ভরে থাকলে পানির কী জাত যায় মহামান্যি?' দেশে দেশে, পথে পথে ঘুরে পথই ওদের করে তোলে অসম্ভব বিনয়ী।

সাপুড়িয়াদের বিবাহ রীতি রেওয়াজের সুন্দর একটি চিত্র লেখক তুলে দিয়েছেন শীতল-ফতিমার বিবাহ প্রসঙ্গে। শ্রাবণ সংক্রান্তির সময় সাপুড়িয়ারা দল বেঁধে যায় 'খাইরোচুলোবে' (বিদেশে)। কেদার সাপুড়ে খেদাইতলার মেলায় যায়। সেখান থেকে সুন্দরবন, তারপর সে নিখোঁজ হয়। সাপুড়েদের অনুমান তাকে সুন্দরবনের 'মর্ক' (বাঘ) খেয়ে ফেলেছে। পুলিশকে ওরা ভয় পায় তাই কোনদিনও 'নারকোল থোতিতে' (থানায়) যায় না। কেদারের বেদেনি অসম্ভবানী কালো সুতোর ডগায় পোড়ামাটির টুকরো বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দেয়। এতেই কেদারের মৃত্যু ঘোষণা হয়ে যায়। কেদারের মজমার প্রসঙ্গে আসে খেদাই তলার মেলা, ঝাঁপান উৎসবের মতো লোক-উৎসবের বর্ণনা। খেদাই তলার মেলার উদ্ভবের কাহিনির মতো লোককাহিনির উল্লেখ। এ সবই লেখক গভীর সহমর্মিতায় বর্ণনা করেছেন। কারণ বিলুপ্তপ্রায় এই সব লোককাহিনিকে যথাযথ ভাবে ধরে রাখতে না পারলে এই সব ব্রাত্য প্রান্তিক কাহিনিও একদিন ওই মানুষগুলির মতোই হারিয়ে যাবে।

কামিনী বেদেনীর প্রসঙ্গে আসে সাপুড়ে দলের কিছু নিষ্ঠুরতার দিক। অন্য জাতে সাপুড়েদের বিবাহ নিষেধ, ভিন্নজাতে বিবাহের কারণে কামিনী বেদেনী হয়েছিল দলছাড়া, তার প্রেমিককে নৃশংস ভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বহুদিন পর বহুরূপী হয়ে মোশেলের দেবীর ছদ্মবেশে কেদার সাপুড়িয়ার একটি গোপন ব্যথার মতো তার সামনে এসে কামিনি বেদেনির মনে পড়েছে, ফেকনী বেদেনী তাকে বলেছিল—

> ''চলে যা, পালিয়ে যা ... সর্দার যেন দেখতে না পায় ... এই দলে থাকলে, কোনদিন বেদেনি তুই ভালোবেসে গর্ভ পাবি না, গর্ভদাতাকে সর্দারই নিয়ন্ত্রণ করবে। পালিয়ে যা মাগান্‌তা দল পাবি ... কোথাও না কোথা অন্য দল পাবি এই দুনিয়ায় মাগান্‌তার অভাব নাই।''

কিরিটি সর্দারের দল ছেড়ে নালু সাপুড়িয়ার ছেলে শীতল বেদে তার স্ত্রী ফতিমাকে নিয়ে একদিন নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। সর্দারের নির্দেশ সে মানেনি। সাপুড়ে জীবনের মতোই চঞ্চল পরিযায়ী পাখিদের উড়ে যাওয়া দেখে শীতল বেদের মনেও তার প্রাচীন যাযাবরী বৃত্তিটি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল সাপুড়ে আর যাযাবর পাখি তো প্রায় একই। সাপুড়েদের ডানা না থাকলেও তাদের কোন রাষ্ট্র নেই। যেমন প্রসন্ন চক্রবর্তীর মনে হয়েছিল—'আমদের ডানা থাকলে আমাদের কোনো রাষ্ট্র থাকত না। এই গোটা পৃথিবীটাই একটা দেশ হত'। শীতল সাপুড়ে এই পরিযায়ী পাখিদের মতোই আজ এই নদী, কাল সেই দল, অন্য রাষ্ট্র এভাবেই তাদের আদিম যাত্রাটিকে চালু রাখতে চায়। তবে, সাপুড়ে নয়, বেদে নয়, সে চায় অন্য জীবিকা গ্রহণ করতে যেখানে সম্মান আছে, আছে মানুষ হিসাবে সমমর্যাদা। কিন্তু সর্দার তো জানে দল ছাড়া সাপুড়ের জীবন-সংগ্রাম কত কঠিন হয়ে যায়। গেল (অনাত্মীয়) দের সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ নয়। তাছাড়া বেদে সমাজ ত্যাগ করে, অন্য জীবিকা গ্রহণ করলে সে সাপুড়েও তো দলছাড়া অনাত্মীয় (গেল) হয়ে যাবে। তখন আর দলে ফিরে আসা সম্ভব নয়। দল তাকে গ্রহণ করবে না। তবু শীতল ফতিমা যাত্রা শুরু করে। ভাবে মাগান্‌তা পাড়ায় বাইরের জগৎটা অন্যরকম। সেখানে আনন্দ আছে, বিলাস আছে, প্রমোদ আছে। বেদেজীবনের মতো শুধু অভাব অভাব আর মোশেল নেই। কলের গান আছে, বেতারের বাণী আছে, সে-জগতে তারা ঠাঁই পেতে চায়। ছিন্নমূল, বিচ্ছিন্ন হয়ে বেদে পরিচয় লুকিয়ে শীতল ফতিমা বাগানগাঁতে নৌকার কারিগর কাঠপঞ্চুর আশ্রয় পায়। এই প্রথম কোনো সাপুড়িয়া নিজের বৃত্তিকে উপেক্ষা করল। তবে তার পেশার বৈশিষ্ট্যকে সে সহজে ত্যাগ করতে পারল না, সাপুড়িয়াদের লাজুক ব্যক্তিবাদ তাকে সর্বদা আচ্ছন্ন করেই রাখে।

শীতলের নৌকার কারিগর হওয়ার প্রসঙ্গে আসে বিলুপ্তপ্রায় এই শিল্পটির এবং এই পেশার সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলির প্রসঙ্গ। বড় ডিঙির নাম 'আলাগ' 'বাছারি' ডাকাতির জন্য ব্যবহৃত 'ভানলিয়া',

অগভীর জলে ব্যবহার হয় 'ডিঙি', হাটেবাজারে শাক সবজি নিয়ে যাতায়াতের জন্য 'কয়না', হাটে পাথর বয়ে নিয়ে যেতে 'হোলা' 'কোলা' 'ওলা', সুন্দরবন থেকে কাঠ আনার জন্য—'পারুলিয়া', 'বিষ্টুপুরিয়া', 'ভদ্রকুল্লাই' 'খঞ্চরকটি' সম্পদশালী বিত্তবানদের ভ্রমণের জন্য ব্যবহৃত হত 'বজরা'। আসে নতুন গ্রামের হুকুমবাজ শক্তিমান লবণ-ব্যবসায়ী নফরচন্দ্রের প্রসঙ্গ। সেইসঙ্গে লবণ তৈরির সঙ্গে যুক্ত নিম্নবিত্তের মানুষগুলির কথা। 'সাদাঘোড়া'কে এখানে অত্যাচারী ক্ষমতাবানের প্রতীক হিসাবে দেখানো হয়। দীনুদয়াল, নফরচন্দ্র সেখানে একই সমতলে অবস্থিত। অভাবী মানুষগুলোর জীবন তাদের কাছে বিলাসের বস্তু যেন।—'এরা গ্রাম পোষে, পাড়া পোষে, তল্লাট পোষে, মানুষকে অধীনে রাখে। সেই মানুষগুলিকে পুষে পরম তৃপ্তি লাভ করে'। প্রান্তিক নারী চরিত্র হিসাবে যেমন বেদেনি অসম্ভাবাণী, ফাল্গুনী, ফতিমাদের কথা আছে তেমনই পিতু ও পিতুর মায়ের কথা উপন্যাসের পরিসরকে অন্য মাত্রা দিয়েছে।

অথর্ব সর্দার কিরিটি সাপুড়িয়াকে তুলে নিয়ে যায় ছাতাপাটি গ্রামের মানুষ গ্রামের মাতব্বরের সাপের কামড়ের বিষ নামাতে। আছে ছাতাপটির গ্রাম্যজীবনের বর্ণনা। সর্দার গ্রামবাসীদের সাপের আতঙ্ক দূর করতে যুক্তিসম্মত নির্দেশ দেয়। সাপের চরিত্র চিনতে সাহায্য করে। এক জোৎস্নারাতে গ্রামবাসীরা ঝুড়িতে বসিয়ে সাপুড়ে সর্দারকে ফিরিয়ে দিতে এসে, যখন ঝুড়ির ভেতর অসার বৃদ্ধ সাপুড়ের অস্তিত্ব টের পায়, বিপদ বুঝে বিলবোশিয়ায়র তীরে ঝুড়ি নামিয়ে রেখে তারা বিপদ থেকে বাঁচতে ফিরে চলে যায়। 'বেদে সাপুড়িয়া পাড়া থেকে এই বৃদ্ধ প্রাচীন সাপুড়িয়াকে ওরা গোটাটাই তুলে নিয়ে গেছিল, ফেরৎ দেওয়ার সময় গোটাটাই দিতে হবে। ঝুড়ির মধ্যে সাপুড়িয়া এখন ষোল আনার বদল চার আনা হয়ে বসে আছে বাকি আনাগুলি ফেরৎ দিতে না পারলে থানা পুলিশ হয়ে যাবে'। লেখক সরাসরি সর্দারের মৃত্যু প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে, সাপুড়েদের বহু প্রজন্মের বিশ্বাসটিকে সমর্থন করলেন যেন। একশো বছরের সর্দারের মৃত্যু হয় না। একশ বছরের প্রাচীন সর্দারের মৃত্যু হয় না তাই সে কচ্ছপ হয়, সে 'লিরিনির ছেমলো' হয়। লিরিনির ছেমলো (কচ্ছের) তিনশ বছর বাঁচে। দলের কাছে এখন সর্দার নিখোঁজ, সর্দার ছাড়া দলটি অসহায় বোধ করে।

জলিল বেদে আর অসম্ভবানী বেদেনির বিশ্বাস সর্দার একটি প্রাচীন কচ্ছপ হয়ে বিলবোশিয়ার জলে বসবাস করছে। বাস্তব থেকে বিচ্যুত হয়ে একটা আচ্ছন্নতার জগৎ তৈরি করলেন যেন লেখক। সার্কাসের দলের ফেলে যাওয়া অথর্ব মানুষটা যাকে এক নিশ্চুপ গভীর রাত্রে মাঠের আলে বসে থাকতে দেখা যায় অথবা কেদার বেদের মজমার পথে নিধু মাহাতোর মা, খড়ির দাগের মতো বৃদ্ধা যে আলে যতীনের খোঁজ করে, খোঁজ করে চলে তার দেওয়া সেই আশ্চর্য কাঁচের পিণ্ডটির। এইসব চরিত্রগুলির সাহায্যে লেখক বাস্তবের ভেতরই ম্যাজিক রিয়ালিজমের একটি আচ্ছন্ন জগৎ তৈরি করে ফেলেন।

আবার কেদারের মজামার পথের চলমানতার মধ্য দিয়েই আসে অসংখ্য গ্রাম, অসংখ্য চরিত্র, গ্রাম্য দেবতা, প্রান্তিক বৃত্তের গ্রাম্য মানুষ তাদের বিশ্বাস, প্রচলিত গল্প, গাথা কাহিনি। হারকোল গ্রাম সেখানে বসে মজমা করে কেদার বেদে—সে আসলে কথার যাদুকর, কথার ভাঁজে মানুষকে মুগ্ধ করতে পারে, কথা দিয়ে মানুষের মনের রোগ সারাতে পারে। মজামায় যাওয়ার আগে সাপুড়িয়া সেই সব মন্ত্রমুগ্ধ গ্রামবাসীদের কল্পনা করেই আনন্দ পায়, কাছে যাওয়ার উন্মাদনা অনুভব করে। ভাবে তাবিজ কবজ, মূল শিকড়ের বিনিময়ে গ্রামবাসী এই হত দরিদ্র দীন সাপুড়ের হাতে তুলে দেবে কাঙ্ক্ষিত সম্পদ। এভাবেই একদিন সাপুড়ে তার দল তার স্ত্রী-পুত্র-পিতা সমস্ত কিছু বিস্মিত হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। হারকোল গ্রামে চুনের দাগ দেখে সাপুড়ে জানতে চায়—

> ‘ও কিসের দাগ কত্তা?’
>
> ‘সামনে নির্বাচন আসছে। ওইগুলি ভোটের চিহ্নের দাগ, কেন চিনিস না? ভোট দিস নাই? কোনদিন?
>
> না, কীসের ভোট? ভোট বেদেরা দেয় না। শুনেছি একটা কাগজের ওপরে ছাপ মারতে হয়।’ [৩৭]

যাদের কোনো রাষ্ট্র নেই। সমগ্র দেশটা যাদের কাছে বিচরণের ক্ষেত্র তারা কেমন করে বুঝবে নির্বাচনের মানে। এতদিন তার প্রয়োজন তো হয়নি, সাপুড়ে কেবল বুঝে এসেছে, সাপ, ঝাঁপি, আড়বাঁশি, খোন্তা, শিক, সর্দার বেদিনি, আর হাজার হাজার বছরের পুরোনো বেদে জাতির চিকিৎসা পদ্ধতি। কেদারের পথেই পড়ে কুষ্ঠরোগীদের গ্রাম, অপাঙক্তেয় জনবসতি ভূতনাথের থান। ওঝাদের গ্রাম। অদ্ভুত জীবিকার মানুষ, মিথ্যায় যাদের বেসাতি, চতুরতা যাদের অবলম্বন, কিন্তু তারা প্রান্তিক সংখ্যালঘু। বহুরূপী মাগান্‌তাদের জীবনযাত্রার চিত্র, বহুরূপী গ্রামের বর্ণনায় উঠে আসে। ঈশ্বরের সাজে মানুষের কৃপাপ্রার্থী মাগান্‌তা ওরা। সাপুড়েদের মতো মাঙ্গাই তাদের ধর্ম, তাদের জীবন। কৃষ্ণকলাই এই রকমই একজন ঈশ্বরবেশী বহুরূপী। কেদারকে সে বলে তাদের পেশায় এখন ঠগ্‌বাজ, জোচ্চুরিতে ভরে যাচ্ছে, মানুষ তাদের সম্মান করে না, অবহেলা করে, মুখ টিপে হাসে। এ অবহেলার দান গ্রহণ করতে তার বড়ই কষ্ট হয়। কারণ উপেক্ষার দান বড় অসহনীয়। তবু এই তাদের ধর্ম। ধর্ম পালনে তো কারও অসম্মান হয় না এটাই পাওনা।

বেদেদের অনেক ভাগ আছে। যেমন যারা সাপুড়ে তারা নিজেদের মালবেদে বলে। বিচরণের নেশা সব বেদেদেরই রক্তে আছে। তবে তারা ভিখারি নয় তাই কেদার নিরুদ্দেশ হলে তার বেদেনি অসম্ভবানী কখনও ভিক্ষা করে না। গেরিগুগলি সন্ধান করে বিলবোশিয়ার ধারে, মিঠে আলু সিদ্ধ করে পুত্র মিতুকে বড় করে। কারণ দল তখন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধীন। খড়ের দড়ি

বেঁধে বা ঘাসের কাজ করে সে জীবন ধারণ করে। একদিন কেদার সাপুড়িয়াও ফিরে আসে। সেও মনে করে তাদের শতাব্দী-প্রাচীন কিরিটি সর্দার বাতাস হয়ে গেছে। মাগান্‌তা রাজার কাছে চলে গেছে। একশো বছর ধরে মেঙ্গে মেঙ্গে জীবন ধারণ করে আর 'খেনুশ' (মানুষ) থাকে না, বাতাস হয়ে যায়। মাগান্‌তা জীবনে কখনো কখনো সাপুড়েরাও ক্লান্ত হয়ে যায়। জলিল বেদের মতো মনে হয় যেদিন থেকে মাগান্‌তা রাজা দেশ ছাড়া সেদিন থেকে তাদের কোনো দেশ নেই। এই এতবড় ভারত দেশটার তারা কেউ নয়। তাদের কাছে তার তাই কোনো চিহ্নও নেই। জলিল ক্লান্ত স্বরে এক সময়ে অসম্ভবানীকে বলে—

> ''এই দেখ আমরা হাঁটছি আমাদের পায়ের নীচে ধুলা দলিত হচ্ছে, তাও তো ধূলাকে দলিত করার মতন কেউ আছে। যে দলিত হয় সে একদিন না একদিন মাথায় ওঠে। বাতাস এলে তাই ধুলা মাথায় ওঠে। আমরা ধুলার থেকেও নীচে। আমাদের দলিত করার জন্য কেউ নাই। মাঠের ধুলা গুলির ঠিকানা আছে, মালিক আছে। বড় ক্লান্ত লাগছে, আরও কত পথ হাঁটতে হবে, আরও কত মজমা করতে হবে।" [৩৮]

বেদেনিদের জীবনও বড় অদ্ভুত সাপুড়েরা মজমায় গেলে তারাও বেরিয়ে যায় আশেপাশের বিল বাদার ঘুরে শাক, গেরি, গুগলি, কাঁকড়া, বুনো হাঁসের ডিম সংগ্রহ করে এনে প্রতিদিনের পাত বৈচিত্র্যে ভরিয়ে তোলে। উদরের জন্য যতটা পারে প্রকৃতির কাছ থেকে সংগ্রহ করে নেয়। সন্ধ্যায় বেদেরা ফিরলে ঝাঁপিগুলি যত্নে আদরে গুছিয়ে রাখে, সারাদিনের প্রতীক্ষার পর বেদেনিরা তখন আঁখাখোঁকার (উনুনের) আগুন উসকোবে। লিরিনিতে (জলে) গ্যল (চাল) ধুয়ে নেবে। লালুন (তরকারি), বেশির ভাগ সময় শিকার করা পশুমাংস তারা রান্না করবে। সন্ধ্যার অবসরে যেন আঁখাখোঁকার আগুনকে সাপুড়ের মৌচাকের মধুর মতন লাগে। এরই মাঝে আছে সভ্য সমাজের লোলুপ দৃষ্টি। বেদিনিরা সে-দৃষ্টিকে হজম করতে বাধ্য। জলিল বেদের মনে হয়, কতপথ হাঁটা। গ্রামের জীবন তার উৎসব পার্বনে অপাঙক্তেয় হয়ে মাঠের এক কোণে পড়ে থাকো, মানুষ দিলে তবেই বাঁচা। তাদের জীবনটা যেন শুধু মজমার জন্য, উদর-পূরণের জন্য। এই অপাঙক্তেয় জীবনটাকে এইভাবে বহন করে যাওয়া বড়ই কষ্টের। মানুষের কত অবহেলা, তুচ্ছ ভাবকে সম্পদ করে, মানুষের চরণের কাছে জীবন সমর্পণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। এভাবেই যন্ত্রণার বিষকে ধারণ করে তারা নীলকণ্ঠ হয়ে জীবন ধারণ করে, বেঁচে থাকে, টিকে থাকে। এভাবেই মজমায় গিয়ে উপস্থিত মানুষের সামনে শ্রম-পরিশ্রম-কথা ও কল্পনার জাল বুনে চলে। ভারের কথা বলে, ভাবের কথা না বললে মানুষ মোশেল, শিকড় ও মূলকে সহজে বিশ্বাস করে না, দানও দেয় না। বিশ্বাসে কখনও কখনও শিকড়ের গুণ ফলে অবিশ্বাসে তা নির্গুণ হয়, কেদার সাপুড়ে বৃদ্ধ হয়েছে তার পুত্র মিতু সাপুড়িয়া এখন সাপের খেলা দেখায়—

''দ্যাখ্লেন গো কর্তা বাবুরা ... দ্যাখলেন মাগো বোনেরা, দেখছেন সাপের খেলা নানান বর্ণের সাপের খেলা ... জঙ্গলিয়া সাপ, কালনাগিনী সাপ ... ক্ষয়ে গোখরো ... আলকেউটে ... বালিবোরা ... শাঁখামুঠি সাপ, মীতু হাতে নিয়ে ঘরঘরিয়ে বিষম চাকী বাজাচ্ছে। ডুগ ডুগ ... আড়বাঁশিতে ফুঁ দিয়ে ঝাঁপির ঢাকনা খুলে জীবন মরণের খেলায় মেতেছে, ঝাঁপির পর ঝাঁপি ... ঝাঁপির ভেতর থেকে দেখা আলবোড়া সাপ। আলবোড়া সাপ বড় বেশি নিরিবিলিতে থাকে। চলতে থাকলে, টেয় পায় না কেউ। ঘাসের ওপরে বিষ ছড়ায় মানুষের শরীরের সঙ্গে লাগলে, মানুষের শরীর ফেটে যায়। ... দেখা তুই একবার ঘাসের উপর বিষ ছড়িয়ে দিয়ে খেলা দেখা ... কর্তাবাবুরা ... মান্যিগণ্যিরা কিছু দিবেন গো ... আপনার সখ আছে তাই আপনি দেখছেন ... আর জীবন মরণের বাজি ধরে আমি পেটের জন্য দেখাচ্ছি খেলা। ... এই দ্যাখেন।'' [৩৯]

প্রসন্ন চক্রবর্তী কেদারকে তাদের জাতির উৎপত্তির ইতিহাস শোনায় বই পড়ে। শকুনদের সঙ্গে বেদেদের বিচরণের ইতিহাস শোনায়—'দেশটির নাম মিশর, অনেক অরণ্য, অনেক দেশ মহাদেশ, অনেক সাগর নদী পার হয়ে সেই দেশ। সেই দেশেই প্রথম মাগান্তারা ঝাঁপিতে সাপ নিয়ে বিচরণ করতে শুরু করে। কেদার সাপুড়িয়া তোদের পূর্বপুরুষরাও হাজার বছর আগে ওখান থেকেই এসেছিল।' কিন্তু লিখিত ইতিহাসকে তো ওরা মানে না। মুখের ইতিহাসই ওদের কাছে বড়, সে-কাহিনিতেই ওদের অধিক বিশ্বাস। 'আমরা বহু দেশেই বিচরণ করি, আমরা ওখান থেকে আসব কেন ... মাগান্তা রাজার রাজত্ব ছিল 'হুগলীর ধনেখালিতে' এ ইতিহাস সে বহন করবেই কিছুতেই ভুলতে দেবে না যতদিন তারা টিকে থাকবে সভ্যতার বিপরীতে।

সময় দ্রুত বদলে যেতে থাকে নবগ্রাম বদলায়, আধা শহর হয়ে ওঠে, সাপুড়িয়াদের বদল নেই বেদে পাড়াটি একই রকম থাকে। এরই মধ্যে সাপুড়িয়ারা খবর পায় 'দেশে আইন এসেছে, ঝাঁপিতে সাপ নিয়ে বিচরণ করলে, সাপ শিকার করলে, নাটকেল (পুলিশ) গ্রেপ্তার করতে পারে। হাতে নাতে ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই'। কিন্তু তারা ভাবে—যারা মেঙ্গে মেঙ্গে খায় তাদের সঙ্গে সরকার নামক বস্তুটির এহেন রসিকতা কেন? অশোক জানায়—

''১৯৭২ সালের আইন অনুযায়ী ভারত সরকার ঘোষণা করেছে কোন বন্যপ্রাণী শিকার করা যাবে না, হত্যা করা যাবে না। বাড়িতে পোষা যাবে না। পুলিশ জানতে পারলে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ফলে জেল জরিমানা পর্যন্ত হতে পারে। প্রয়োজনে জামিন অযোগ্য। আইনটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ১৯৭২ (৫৩ ধারা ১৯৭২), সমগ্র ভারতবর্ষে আইনটি প্রযোজ্য শুধু জম্মু কাশ্মীর ব্যতীত। সুতরাং সাপুড়িয়া সাপ শিকার করলে সে অপরাধী বলে গণ্য।'' [৪০]

কিন্তু সাপ না ধরলে সাপুড়িয়া বাঁচবে কেমন করে? কারণ সাপের সঙ্গে সাপুড়িয়া বাঁচে, সাপুড়িয়ার সঙ্গে সাপ বাঁচে। সভ্যতা তাদের ছায়াস্পর্শ করে না তবে কেন তারা মানবে সভ্যসমাজের

আইন। দেশের সরকার কখন তো তাদের কথা ভাবেনি। ভারতবর্ষ মাগন্তাদের দেশও নয়। তারা দেশের কেউ নয়, তাদের ভোটাধিকারও নেই। তাহলে কেন তারা এ নির্দেশ মানবে? প্রশ্ন জাগে সাপুড়িয়ার মনেও। কিন্তু অশোক বলে—'রাষ্ট্রের মধ্যে থাকলে রাষ্ট্রের আইনি ব্যবস্থা মানতে হবে ... রাষ্ট্রের নিষেধ থাকলে তা মানতে হবে'। তাই সাপুড়িয়া ধর্ম তাদের বিসর্জন দিতে হবে। সাপ ছাড়া অন্য কোন উপজীবিকা তারা গ্রহণ করতে পারে না, তা নিষিদ্ধ। প্রসন্ন চক্রবর্তীর সহায়তায় বেদেদের কিছু ছেলেমেয়ে এখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে। কিন্তু ওরা বলে বিদ্যালয়ে যাওয়া মাগান্তা ধর্মবিরুদ্ধ। টিকে থাকার সব পদ্ধতিকে তারা মানতে চায় না। বলে—'লেখাপড়া শেখার কাজ গামার মানে ভদ্রলোকের কাজ, আমরা তা শিখব কেন?' বেদেদের চারটি 'খুম' আছে। বাজিকর, মাগান্তা, পটমাগান্তা, কলন্দর মাগান্তা আর সাপুড়িয়া মাগান্তা। যারা হাতে হাতে যাদু দেখিয়ে বেড়ায় তারা বাজিকর বেদে। যারা স্থানে স্থানে ঘুরে ছবি আঁকার ও নকশার কাজ করে তারা পটমাগান্তা, যারা বাঁদর-ভালুক খেলা দেখায় তারা কলন্দর মাগান্তা, সাপুড়িয়ারা হল মাল মাগান্তা। এই তাদের পেশা। এরা কেউ বিদ্যালয়ে যায় না। জানিয়ে দেয়—'গামারদের মানে ভদ্দরলোকের বিদ্যা আমাদের প্রয়োজন নাই'। অক্ষর তারা চেনে না, অক্ষরের বিষয় বুঝতেও পারে না, তাদের নিজেদের ভাষায় তো আর কোনো লিপি নেই।

সাপুড়েদের মজমায় যাওয়া এখন আর নিরাপদ নয়। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন সাপুড়িয়াদের হাজার বছরের পেশাটিকে বিপন্ন করে তোলে। এখন তাদের সাপ ছাড়াই মজমা করতে হয়। কারণ মজমাই তাদের অন্ন। তবে সাপ ছাড়া মজমা তেমন জমে না, উপার্জনও কম হয়। এভাবেই দেশ কাল রাষ্ট্রব্যবস্থা একটি পেশা আর একটি জনজাতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দেয়। জটিলতা বর্জিত সহজ আনন্দময় জীবন যায় বদলে, গতিময় জীবন এক ঝটকায় থেমে যায়। পুলিশ গৌরাঙ্গ সাপুড়িয়ার ছেলে লালু সাপুড়িয়াকে ধরে নিয়ে যায়, ওরা ভয় পায়, ভীষণ ভয়। অন্যদিকে সাপুড়িয়াদেরও সংগঠনের কাজ চলতে থাকে যদিও সে কাজ করে সভ্যমানুষ। বিপন্ন অবস্থায় কেদার সাপুড়িয়া কঠিন প্রশ্নটি করে প্রসন্ন চক্রবর্তীকে—'কি মনে হচ্ছে জানেন? আমাদের বেদিয়াদের যত সাপ, ভালুক, বাঁদর নেউল আর ধনেশ পাখি আছে সব ছেড়ে দিয়ে দেশের সরকারের কাছে বেঁচে থাকার জন্য কোনো কাজ চাই। দেবে না মহামান্যি? সরকার কোন কাজ দেবে না?' এভাবে করুণ আর্তির সঙ্গে প্রশ্ন করে আবার মাঝেমাঝে সাপের মতোই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। ভাবে সাপ মেরুদণ্ডহীন কিন্তু তাদের মেরুদণ্ড আছে—'আমার মেরুদণ্ড আছে আমি অন্যের উপকার করতে পারি। আমার বিষ নাই। আমি কারও ক্ষতি করতে পারি না'। সাপুড়িয়াদের মতো সকল মাগান্তাদের অস্তিত্বই এখন বিপন্ন। কলন্দর মাগান্তা মহম্মদ ফারুকের কণ্ঠেও শোনা যায় সেই একই কষ্টের কাহিনি। সেও বলে কেদারকে—'চাচা মাঙ্গতে আর ভালো লাগে না ... মাঝে

মাঝে দেখা হলে সাহস পাই। তখন মনে হয় এ জগতে আমি একা মাগান্‌তা না, অনেক মাগান্‌তা আছে, আমার মত কেউ জোদর, কেউ ঝাবর, কেউ মোশেল কেউ বিছার তেল নিয়ে বিচরণ করে।' বিচরণই তাদের জীবন, সেই বিচরণের সঙ্গে এই বেদেদের বিনয় আর মান্যতার কথা কোনোদিন জগৎবাসী জানতে পারে না। এখন তাদের জাত গেছে। সাপুড়িয়ারা নিজ নিজ কুটিরের সামনে আঙিনা গড়ে নিচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। মাগান্‌তা পাড়ার ভেতরে ভিন্নভাব প্রগাঢ় হচ্ছে। একমাত্র হাঁড়িরাম ঠাকুর তাদের বন্ধনকে রক্ষা করে চলেছে। ওরা লক্ষ করছে মানুষের মন ও মননের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবসভ্যতাও কেমন করে বদলে যাচ্ছে। আর ওরা তো অনুকরণবাদী।

একদিন শীতল বেদে আবিষ্কার করল বিলবোশিয়ার জলে বসবাসকারী তিনশো বছরের প্রাচীন 'লিরিনির ছেমলো' (কচ্ছপটা) 'লুগিয়ে গেল' (মরে গেল)। তাদের এতদিনের বিশ্বাসের মৃত্যু ঘটল। কেদারও যেন বিশ্বাস করল এই তার পিতা কিরিটি সর্দার এতদিনে তাদের ছেড়ে গেল যখন তারা সত্যি সত্যি বিপন্ন। কচ্ছপটা যেন একাধারে তাদের বহুশতাব্দী প্রাচীন সর্দার কিরিটি সাপুড়িয়া এবং তাদের পেশার প্রতীক। কেদারের মনে পড়ে সর্দারের শেষ ইচ্ছার কথা—একটা 'বিয়োর'। সে চায় কচ্ছপটাকে একটা নিশ্চিন্ত বিয়োরে স্থাপন করতে। কিন্তু বাদ সাধে উন্নত, পরিশীলিত সভ্যতা। 'লিরিনির ছেমলোডাবে গর্তের মধ্যে কবর দিলে সর্দার যেখানেই থাকুক তার মনস্কামনা পূর্ণ হবে'। কিন্তু তাদের সে-আশা সর্দারের সে-আকাঙ্ক্ষা সভ্যতার উন্নতিকল্পে অনুন্নত এই মানুষগুলিকে বিসর্জন দিতে হয়। তাদের কল্পনা বিশ্বাস বিলীন হয়ে যায় সভ্যতার আগ্রাসনে। যখন তারা গর্ত করার কাজে ব্যস্ত তখনই আসে বন্যপ্রাণী বিভাগের সার্ভের দল। বনরক্ষীদের নির্দেশে চমৎকার কাঠের বাক্সে করে কচ্ছপটিকে জীপ গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। এটি একটি দুর্লভ প্রজাতির কচ্ছপ, এর বয়স প্রায় তিন-চারশো। এটাকে এখন গবেষণার জন্য সংরক্ষণাগারে রাখা হবে। এসব জেনে অবাক হয়ে, হতাশ হয়ে কেদার বলে—'লিরিনির ছেম্‌লোডা এতদিন একা-একা বিচরণ করত। মরে গিয়ে ও ভদ্দরলোকেদের হয়ে গেল'। কচ্ছপটাকে সুন্দর কাঠের বাক্সে ভরে নিয়ে বনবাবুরা চলে গেল। ঘটনার আকস্মিকতাকে বুঝে উঠার আগেই সময়ের বিচিত্র ভারে ন্যুব্জমান কেদার সাপুড়িয়ার ভাবনার মধ্য দিয়েই লেখক বলে নেন—

> 'সময় কখনও বেদে হয়, আবার কখনও গামার (ভদ্রলোক) হয়। কেদার নিজেই নিজের প্রতি হেসে নিয়ে ভাবল; এমনই চৈত্র মাস ছিল সেদিন'।

বহুবছর আগে যে-পথ ধরে এক চৈত্র মাসে শতাব্দীপ্রাচীন এক বৃদ্ধ সাপুড়িয়া দল নিয়ে নবগ্রামে প্রবেশ করেছিল সে-পথ ধরেই চলে যায় জিপ গাড়িটি। আর ঠিক তখনই কেদার সাপুড়িয়া অবাক হয়ে দেখে—

''একটি বেদের দল ক্রমশ, পারের-পর হাঁটুজল ভেঙে, নিজেদের পোশাকগুলি পতাকার মতন ওড়াতে-ওড়াতে এগিয়ে যাচ্ছে নবগ্রামের দিকেই। প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এক সর্দার সামনের দিকে ঝুঁকে লাঠিতে ভর দিয়ে দলটির একেবারে সামনে, এগিয়ে যাচ্ছে। কেদার সামনে এগিয়ে এসে, কীগো মাগান্া সর্দার দল নিয়ে কোনদিকে? কে গো তুমি?

পটুয়া দশরথ মাগান্তা।

পাড়া নেই?

না বিচরণ করি।'' [৪১]

এভাবেই একটি জনজাতির কাহিনি শেষ হয়ে আর এক জনজাতির জীবন-সংগ্রামের কাহিনি শুরু হয়ে যায়। একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বিলুপ্ত হয়ে নতুন ইতিহাসের চলা শুরু হয়। এভাবেই একজন কাহিনিকারের 'ধরতাই' ধরে নেই পরবর্তী কাহিনিকার। এভাবেই একটি গবেষণার সমাপ্তি হয়ে পরবর্তী গবেষণার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে যায়। এভাবেই সময় একদিন এক জীবনকাহিনিকে আবিষ্কার করে অন্য জীবনকাহিনিকে প্রতিষ্ঠা দিতে। একটি গবেষণাপত্র শেষ হয় 'ধরতাই' রক্ষা করার জন্য আর একটি গবেষণাপত্র প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়ে যায়। এভাবেই চলতে থাকে, চলতেই থাকে ...

তথ্যসহায়কসূত্র

১. জহর সেন মজুমদার, 'উপন্যাস : সময় সমাজ সংকট', বুকস স্পেস, প্রথম প্রকাশ, জুলাই ২০১০, কলকাতা, পৃষ্ঠা—২৮০।

২. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'এ সময়ের আখ্যান', কোরক, প্রাক্ শারদ সংখ্যা ১৪১৫, সম্পা. তাপস ভৌমিক, কলকাতা, পৃষ্ঠা—২৫।

৩. তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'আমার উপন্যাস লেখার ইতিহাস', কোরক, ঐ, পৃষ্ঠা—৬৫।

৪. ঐ, পৃষ্ঠা—৭০।

৫. সৈকত রক্ষিত, 'প্লাস ওয়ান', কোরক, ঐ, পৃষ্ঠা—৮৭-৮৮।

৬. ঐ, পৃষ্ঠা—৮৮।

৭. অমিতাভ গুপ্ত, 'বাংলা উপন্যাস : একটি প্রস্তাব', উপন্যাসের সাহিত্যতত্ত্ব, সম্পা. অঞ্জন সেন, উদয় নারায়ণ সিংহ, গাঙ্গেয়পত্র ১৩৯৭, ঐ, পৃষ্ঠা—৮০।

৮. সৈকত রক্ষিত, 'প্লাস ওয়ান', ঐ, পৃষ্ঠা—৯৪।

৯. ঐ, পৃষ্ঠা—৯২।

১০. সৈকত রক্ষিত, মহামাস, গল্পসরণি, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪১২, সিউড়ি, বীরভূম, পৃষ্ঠা—১২।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা—১৪।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা—৩৬।

১৩. সৈকত রক্ষিত, 'প্লাস ওয়ান', ঐ, পৃষ্ঠা—৯০।

১৪. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'এ সময়ের আখ্যান', ঐ, পৃষ্ঠা—৩০।

১৫. নলিনী বেরা, শবরচরিত, প্রথম পর্ব, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক মেলা, জানুয়ারি ১৯৯৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা—১২।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা—৪২।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা—৬০।

১৮. ঐ, পৃষ্ঠা—৭৪।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা—৯০-৯১।

২০. নলিনী বেরা, শবরচরিত, দ্বিতীয় পর্ব, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা পুস্তক মেলা, ১৯৯৯, কলকাতা, পৃষ্ঠা—১৪৪-১৪৫।

২১. নলিনী বেরা, শবরচরিত, প্রথম পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা—১২২।

২২. নলিনী বেরা, শবরচরিত, দ্বিতীয় পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা—৩০।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা—১২৫।

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা—১৮২।

২৫. ঐ, পৃষ্ঠা—২১৩।

২৬. নলিনী বেরা, শবরচরিত, প্রথম পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা—১১৪-১১৫।

২৭. নলিনী বেরা, 'আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূ-প্রকৃতি', কোরক, ঐ, পৃষ্ঠা—১১৪-১১৫।

২৮. নলিনী বেরা, শবরচরিত, দ্বিতীয় পর্ব, ঐ, পৃষ্ঠা—৩০।

২৯. পৃথ্বীশ সাহা, 'বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ নির্মাণ : একটি খসড়া', দিবারাত্রির কাব্য, উপন্যাস সংখ্যা-৩, সম্পাদনা, আফিফ ফুয়াদ, পৃষ্ঠা—১২২।

৩০. নলিনী বেরা, 'আত্মীয় পরিজন-ভূগোল-ভূ-প্রকৃতি' কোরক, ঐ, পৃষ্ঠা—৫৯।

৩১. শুভংকর গুহ, 'বিয়োর', করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১১, কলকাতা, পৃষ্ঠা—১২।

৩২. ঐ, পৃষ্ঠা—২৩।

৩৩. ঐ, পৃষ্ঠা—৩১।

৩৪. ঐ, পৃষ্ঠা—৩৬।

৩৫. ঐ, পৃষ্ঠা—৪৫।

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা—৫২।

৩৭. ঐ, পৃষ্ঠা—১৭৪।

৩৮. ঐ, পৃষ্ঠা—২১৩।

৩৯. ঐ, পৃষ্ঠা—২২৬।

৪০. ঐ, পৃষ্ঠা—২৩৪।

৪১. ঐ, পৃষ্ঠা—৩০৪।